প্রেমময় রামঠাকুর

ভবেশ দত্ত

॥ পরিবেশক ॥

বুক হোম

৩২, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
বিশ্বজিৎ মজুমদার
গ্রন্থগৃহ
২২সি কলেজ রো
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : অলক চৌধুরী

মুদ্রাকর :
জলি আর্ট প্রেস
তুষারকান্তি বসাক
৭/১এ, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রো
কলকাতা-৭০০০০৯

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব

মাতৃসাধক শ্রীশ্রীসুদীন কুমার মিত্রকে—

লেখকের অন্যান্য বই :

ভারতের সাধিকা

ভারতের পরমা সাধিকা

তারাপীঠের সাধক

সাধক কমলাকান্ত

প্রভু নিত্যানন্দ

সাধক হরিদাস

সাধক তুলসীদাস

পরমহংস স্বামী নিগমানন্দ

প্রথম কথা

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের পূতজীবন কথা ভাষায় প্রকাশ করি এমন শক্তি আমার কোথায়? সারাজীবনে তিনি কোনদিন কোন প্রচার চান নি। সবসময় তিনি অন্তরালেই থাকতে চেয়েছিলেন। তাঁর জীবনী কেউ লিখুক এও তিনি চাননি। জীবনী লেখার কথা কেউ বললে তিনি জবাব দিতেন—জীবনই নেই তার আবার জীবনী। সঠিক ভাবে তাঁর জীবনের ইতিবৃত্ত তাই কেউ কোনদিন ধরে রাখতে পারেন নি। যে সমস্ত বই আজ পর্যন্ত ঠাকুর সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়েছে তা ঐ টুকরো কথা একত্র করে এক জায়গায় করা ছাড়া আর কিছু নয়।

দীর্ঘদিন ধরে মনে একটা বাসনা ছিল ঠাকুরের কথা লিখব—বহু মানুষের কাছে ঠাকুর সম্বন্ধে জানার জন্য গিয়েছি। যেখানেই তাঁর শিষ্যের সন্ধান পেয়েছি তাঁর কাছেই ছুটে গিয়েছি, যেটুকু তাঁরা আলোকপাত করেছেন সেগুলো লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে যে সমস্ত বই হাতে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলেছি। এত অতি সাধারণ অথচ এত বড় সাধক সারা ভারতবর্ষে আর দৃষ্ট হয় না। তাঁকে দেখলে কোনদিন সাধু-সন্ন্যাসী বলে মনেই হত না। সাধারণ একটা কাপড় গায়ে একটা ফতুয়া অথবা একটা উত্তরীয় এই ছিল তাঁর বেশ। ছিল না জটা, ছিল না গেরুয়া কাপড়, ছিল না রুদ্রাক্ষের মালা অথচ তিনি ভারতবর্ষের সাধন ক্ষেত্রে বিরাট এক মহীরুহ। মানুষের সেবাই যে ঈশ্বর সেবা এ তিনি দেখিয়ে গেছেন।

এই দিকপাল জ্ঞান তাপসের কথা লিখতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম এই ভেবে যে এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে কিনা। জানি না কতটা সম্ভব হয়েছে। যেটুকু হয়েছে তা অবশ্যই শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাবলে। অলক্ষ্যে তাঁর কৃপা না থাকলে এ কাজ কিছুতেই আমার

দ্বারা সম্ভব হত না একথা আমি জোর করেই বলতে পারি। তাঁর কাজ তিনিই করিয়েছেন আমাকে দিয়ে।

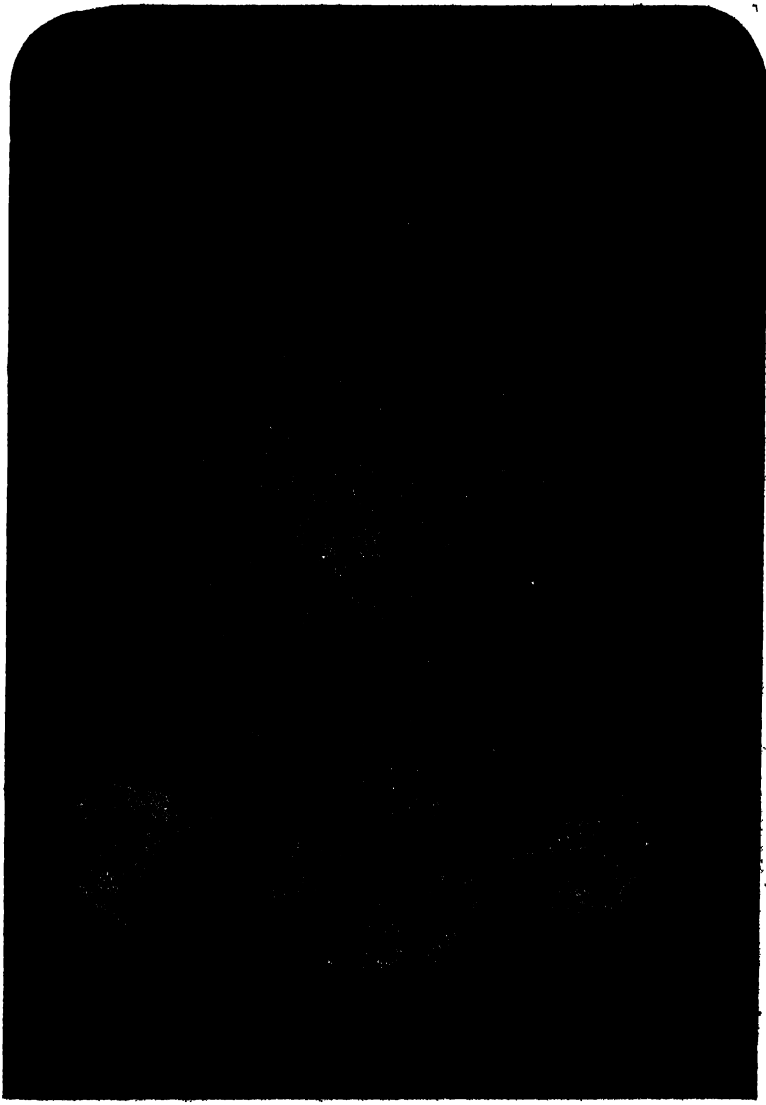
যাদবপুর কৈবল্যধামের প্রধান, পুজনীয় শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ পড়ে আমাকে কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছিলেন সে জন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

এ বই লিখতে গিয়ে যাঁদের কাছে শ্রীঠাকুর সম্বন্ধে তথ্য পেয়েছি তাঁরা হচ্ছেন—নদীয়ার গয়েশপুরের ঠাকুর আশ্রিত ডাঃ যুধিষ্ঠির সিংহ, ডাঃ প্রাণতোষ বসু, শ্রীঅনিল বসু, শ্রীরাজেন কর্মকার ও রানাঘাট রামঠাকুর আশ্রমের শ্রীপরিমল সাহা। নিম্নলিখিত বইগুলি থেকেও সাহায্য পেয়েছি—

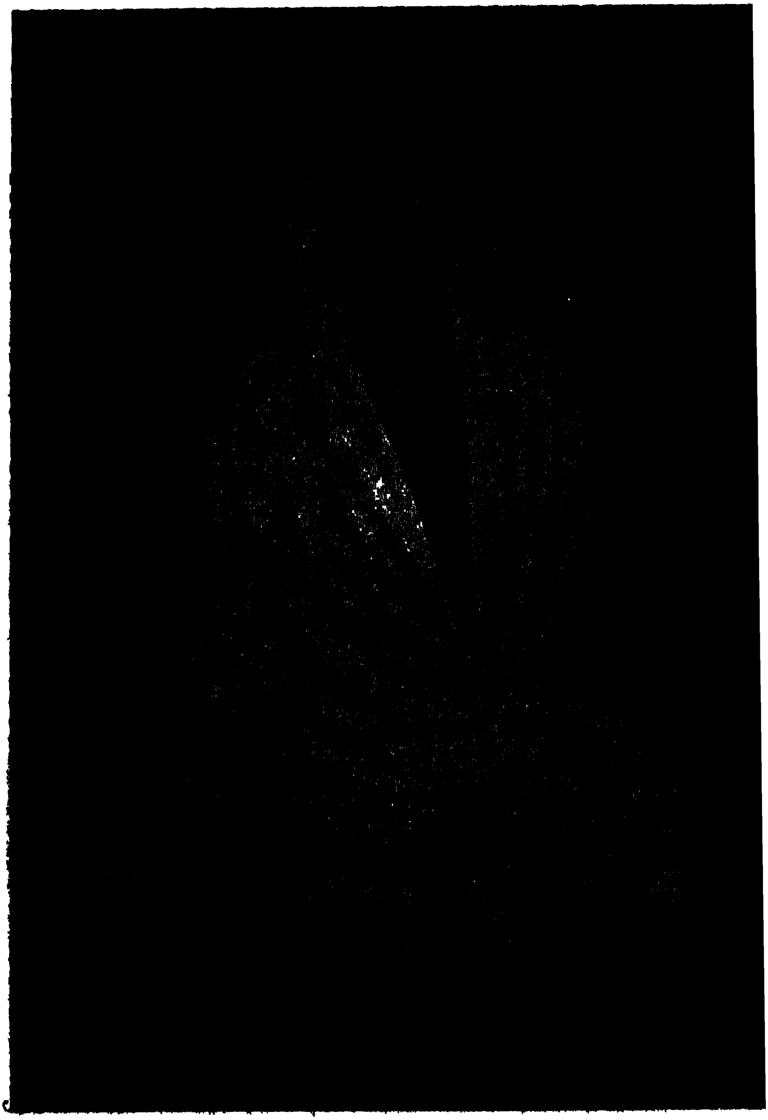
শ্রীশ্রীরামঠাকুরের জীবন কথা—শ্রীমহেন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীশ্রীরামচন্দ্র দেব—শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত
শ্রীশ্রীরামঠাকুরের কথামৃত বিন্দু—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী
সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গে-(১ম খণ্ড)—ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ
শ্রীগুরু শ্রীশ্রীরামঠাকুর—শ্রীরোহিণীকুমার মজুমদার
শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের শ্রীচরণে শতকোটি প্রণামান্তে।

কামারপাড়া, রানাঘাট — গ্রন্থকার
নদীয়া।
পৌষ, ১৩৫৩ সাল



শ্রীশ্রীরামঠাকুর



যুবা বয়সে—শ্রীশ্রীরামঠাকুর

[যাদবপুরের কৈবল্য ধাম-এর সৌজন্যে]

এ আবার কেমন ধারা সাধু !

মাথায় জটা নেই, পরনে গেরুয়া নেই, হাতে চিমটা কমণ্ডলু নেই, কাঁধের উপর বাঘছাল নেই, ত্রিশূলই বা কই, হাতে গলায় মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে সিন্দুরের টিপ তাও নেই।

তবে এ কেমন সাধু !

এই কি সাধুর বেশ—পরনে একখানা খদ্দরের ধুতি, গায় একটা ফতুয়া, গলায় তুলসীর মালা, নগ্ন পদযুগল। বড়জোর কখনও কাপড়ের সাদা জুতা পায় দেন। কখন কোথায় যান, কি করেন তাও বোঝা যায় না। এই দেখা গেল কোন শহরের এক কোণে কারও বাড়িতে বসে আছেন, পরক্ষণে দেখা গেল তিনি আর সেখানে নেই। অনেকক্ষণ বাদে হয়তো চোখে পড়ল তাঁকে, শহরের পশ্চিমে কোন এক দরিদ্রের কুটিরে রোগীর সেবায় ব্যস্ত।

এই আছেন এই নেই, হঠাৎ দৃশ্য আবার অদৃশ্য !

ঠিক যেন জলের বুদ্‌বুদ্। বুরবুরি কেটেই মিলিয়ে যান। এই ভেসে উঠলেন আবার ডুব দিলেন পানকৌড়ীর মত। যারা তাঁর সঙ্গে থাকার চেষ্টা করেন তারাও তাঁকে চিনতে পারেন নি। বুঝতে পারেন নি।

যিনি বোধাতীত, যিনি জ্ঞানাতীত, যিনি সুখ, দুঃখ, শোকতাপের অতীত তাঁকে কি সহজে বোঝা যায় ! কি এক অজানা রহস্যে ভরা তাঁর জীবন। কি এক দুর্জ্ঞেয় পটভূমিকা তাঁর সারা জীবনের আঙিনায়। ধরার চেষ্টা করতে গেলে বিফল হতে হয়। ধরা যায় না। ধরতে গেলে ফস্‌কে যায়। তাঁর রাঙাচরণে মাথা রেখে দিলে মনে হয় স্পর্শ পেলাম না। মানুষ তাঁর পরম আপনজন—কিন্তু মানুষের ভিড়ের মাঝে তিনি হারিয়ে যেতে ভালবাসেন। ঠিক যেন লুকোচুরি খেলা। এই যেন তাঁর মনের ভাব, কই খোঁজ আমাকে, ধর আমাকে,

আমিতো সবার কাছেই আছি। ধরার চেষ্টা কর। গৃহী হও, যোগী হও, সন্ন্যাসী হও—ভাল করে খোঁজ আমাকে। আমি তোমাদের দুঃখকষ্টের ভাগীদার হব। সাজতে আমি চাই না। সাধারণের মাঝে আমি অসাধারণ হয়েও থাকতে চাই না। আমি শুধু সাধারণ নয়, অতি সাধারণ।

চিংড়ি মাছ খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছুই থাকে না। যা থাকে তা অতি সামান্য। এ নিষ্ফল প্রসাধনে প্রয়োজন কি। যেটুকু সার যেটুকু আসল বস্তু সেইটুকু পাওয়াই তো বড় কথা।

"সন্ন্যাসী না হইও তুমি বৈরাগী না হইও।
ঘরে বসে কৃষ্ণনাম মায়েরে শুনাইও।"

সন্ন্যাসী বা বৈরাগী হওয়াটাই বড় কথা নয়। আসল কথা কৃষ্ণনাম। তাই তিনি অতি সাধারণ। মানুষের বেশে, মানুষের মত আচার-আচরণ করে সবার শোক-তাপ নিবারণ করাই তাঁর ব্রত। তাঁর সাধন-ভজন গূঢ় রহস্যময়। কখন কোথায় সাধন-ভজন করেন সঠিক কেউ তা বলতে পারে না।

এই রহস্যময় মহাপুরুষ যুগাবতার পরম জ্ঞানতাপস শ্রীশ্রীরামচন্দ্র দেব। সাধক-সাধিকা ভরা ভারতবর্ষের এক নবযুগাচার্য, জ্ঞানারণ্যের বিরাট মহীরুহ, ভারতবর্ষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পঙ্কের মধ্যে প্রস্ফুটিত এক পদ্ম, যার সৌরভে দিকদিগন্ত উদ্ভাসিত। ফুল বনে ফোটে, সে হেঁটে কোন মানুষের কাছে যায় না।

মানুষই আসে তার আকর্ষণে।

কিসের আকর্ষণ, সুগন্ধের আকর্ষণ, সৌন্দর্যের আকর্ষণ।

শ্রীশ্রীরামঠাকুর বাংলা ১২৬৬ সালের ২১শে মাঘ বৃহস্পতিবার রোহিণী নক্ষত্রে শুক্লা দশমীতে অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার নড়িয়া থানার ডিঙামানিক গ্রামে ফুল হয়ে ফুটেছিলেন। গন্ধে, রূপে ভরিয়ে তুলেছিলেন দশদিক। অগণিত দেশের মানুষ, এই নবজাতককে দর্শন করে ধন্য হয়েছিল।

কেন তাঁরা এসেছিল ?

সেই একই আকর্ষণ সুগন্ধের, সৌন্দর্যের।

সুগন্ধ কিসের! অগুরু কস্তুরীর সৌন্দর্য অমলিন সরলতার।

না, সুগন্ধ ভক্তি প্রেমের। সৌন্দর্য নিবেদনের।

প্রেমের ঠাকুর প্রেমের ভিখারী হয়ে এসেছেন মানুষের আঙিনায়। মানুষের আসার শেষ নেই। এই একদল আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। আবার একদল। গ্রামে তো আরও লোকের বাড়ি ছেলেমেয়ে হয় কই এমন ভাবে তো লোক ভেঙে পড়ে না!

ডিঙামানিকের মানুষ তবে কেন এখানে ভিড় করছে ?

কারণ আছে বৈকি! মহামানবের আগমনেই এরকম হয়। আসার আগে কেউ জানতে পারে না। যেই আসেন তখন যেন মনে হয়, হৃদয় দুয়ারে টোকা মেরে জানিয়ে দেন, ওরে আয়, এই তো আমি এলাম। আর কতকাল মায়াজালে জড়িয়ে থাকবি, মায়ার জালে যে হাজারো গিঁট পড়ে গেল। এবার সব ছিঁড়ে বেরিয়ে আয়। এমন জিনিস দেখাব, যা কোনদিন দেখিস নি। এমন জিনিসের কথা শোনাব, যা কোনদিন শুনিস নি। সেদিন ডিঙামানিকের মানুষ বুঝল যে তাদের জীবন ডিঙায় এ মহামূল্য মানিক মাঝি হয়ে হাল ধরতে এসেছেন। আর বুঝি ভয় নেই। কি করবে ঝড় তুফান। কি করবে খরা প্লাবন।

এবার মাঝি হয়ে এসেছেন শ্রীশ্রীরামঠাকুর।

শ্রীঠাকুর বড় হতে থাকুন ডিঙামানিকের পূত মৃত্তিকায়। আমরা একটু পিছনে চলি।

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের কথা লিখছি। এটা তাঁর জীবনী নয়। কারণ তিনি কোনদিন প্রচার চান নি, কেউ তাঁর জীবনী লিখুক এও তিনি চান নি। কেউ জোর করলে তিনি বলতেন, 'জীবনই যাঁর নেই তাঁর আবার জীবনী কিসের ?'

সত্যিই তো সেই মহাজীবনের সন্ধান আমার মত অক্ষম কি করে পাবে। তাঁর সঙ্গে দিনরাত সঙ্গ করেও কেউ তাঁকে বুঝতে পারে নি আর আমার জীবনে তো তাঁকে দর্শন করারই সৌভাগ্য হয় নি।

আমার এ লেখা শ্রীশ্রীরামঠাকুরের কথা, জীবনী নয়। কথার পর কথা গেঁথে এই কথামালা তৈরি করলাম, এতে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই। তাঁর কথা দিয়েই কথার পর কথা ইটের মত সাজিয়ে শ্রীশ্রীরামঠাকুরের কথামন্দির গাঁথলাম। ভাল মন্দ জানি নে, সে বিচারের ভার আমার নয়।

শ্রীশ্রীরামঠাকুর এক জীবনরূপ মহাসমুদ্র। যার কোন কিনারা নেই, তল নেই। আমি সেই সমুদ্রের ধারে বসে ঢেউয়ের পর ঢেউ গুনে চলি, আর আনন্দলহরীর সুর ঝঙ্কারকে ধরে রাখতে চেষ্টা করি। এছাড়া আর তো আমার করবার কিছু নেই।

ত্রিতাপদগ্ধ সংসারের সামান্য মানুষ আমি।—

মায়ার আচরণে জড়ান আমার সারা দেহ। এই বিরাট রাম-সাগরের ঢেউ গুনে সমুদ্রের স্বাদ যদি কিছুটা পাই তাই হবে আমার পরম লাভ। পাব যে এমন জোর নেই। যেটুকু পেলাম তাই সাধ্যাতীত — আমার অসাধ্য সাধনের প্রচেষ্টা। অকপট আত্মার আরতি।

হে দয়াল রাম! এ অকিঞ্চন সম্পূর্ণ নিঃস্ব।

না আছে ভক্তি, না আছে প্রেম, না জানি শ্রদ্ধা, না চিনি একাগ্রতা কেমন। হাত দিয়ে না টান পা দিয়েই না হয় সরিয়ে দিও তাতেই আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

ডিঙামানিকে ঠাকুরের বাড়ির চৌহদ্দিতে ফেরা যাক। তাঁর মহাভাগ্যবান বাবা ও মহাভাগ্যবতী মা'র পরিচয় নেওয়া যাক।

এমন ভাগ্য কজনার হয়!

এমন ভাগ্য হয়েছিল শচীমাতার, এমন ভাগ্য হয়েছিল হারাই পণ্ডিতের। এমন ভাগ্য হয়েছিল ভগবান শংকরাচার্যের মায়ের, এমন ভাগ্য হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জননীর।

অদ্বৈতভূমির মত ডিঙামানিকের মাটি আজ ধন্য।

আজ আবার এসেছেন শ্রীশ্রীরামঠাকুর, কলিতে শ্রীরামচন্দ্রের পুনরাগমন।

ডিঙামানিক ও জপসা গ্রাম।

মাঝে দশ মাইলের ব্যবধান। সেই সময় জপসার মত গ্রাম খুব কমই ছিল। পথঘাট, দালানকোঠা, দেবদেবীর মন্দিরঘেরা এই গ্রামেই বাস করতেন ঠাকুরের পিতা রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার ও মাতা কমলাদেবী। বহু অর্থবান, পণ্ডিত ও জ্ঞানীগুণীর লীলানিকেতন ছিল এই জপসা গ্রাম। জপ ও তপের ভূমি ছিল এই জপসা, জ্ঞানী ও ও গুণীর বিচরণ ক্ষেত্র।

জপসা ছিল ধ্যানের ও জ্ঞানের মহামিলন তীর্থ।

মন্দিরের কারুকার্য সাজানো পুষ্পোদ্যান দেখলে মনে হত কোন এক নিপুণ শিল্পী বুঝি এই গ্রামের নকশা তৈরি করেছিলেন।

জপসার নাম ছিল তখন সকলের মুখে মুখে।

আজ মহাকালের রথচক্রে এ গ্রামের সবই নিষ্পেষিত হয়েছে। সুরম্য অট্টালিকা, মন্দির, সাজান বাগান সবই কীর্তিনাশার গর্ভে চিরশান্তি লাভ করেছে। কোথায় গেল পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, কোথায় গেল সৌন্দর্যের গর্ব!

সবই শেষ হয়ে গেছে—

কিছুই থাকে না সবই একদিন চলে যায়।

"মা কুরু ধনজনযৌবন গর্বম্
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্"

এই সব চেয়ে সত্য—

কিন্তু সবই যদি চলে যায় তাহলে থাকে কি?

থাকে একমাত্র নিত্য বস্তু—যা ছিল, আজও থাকবে।

সে নিত্য বস্তু কি!

সে নিত্য বস্তু নিত্যানন্দময় পরম দয়াল ভগবান।

এ ছাড়া আর সবই তো অনিত্য।

মানুষ ঘর বেঁধেছে যা থাকবে না তাই নিয়ে।

যা নিয়ে ঘর বাঁধলে চিরকাল থাকবে সে ঘর বাঁধে কজন।

কোটিকে গুটিক।

যুগে যুগে কালে কালে এমন ভাবে কত ঘর ভেঙেছে। ঘর উঠেছে আবার ভেঙেছে।

এই তো মহাকালের মহাকাব্য।

পাকা ঘর কি সবাই বাঁধতে পারে?

একদিন জপসা গ্রাম পদ্মার ভাঙনে শেষ হয়ে গেল।

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের পিতা রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার অনিত্য বস্তুব পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে এসে ডিঙামানিকে ঘর বাঁধলেন।

ভাঙা আর গড়া। গড়া আর ভাঙা। এই নিয়েই তো মানুষের জীবন।

এর বাইরে তো আর কিছু দৃষ্ট হয় না।

ঠিক যেন রাতে নিদ্রা যাবার সময় দোরে খিল দেওয়া আবার সকালে দোর খোলা। মাঝখানে যা বিদ্যমান তা দুঃখ কষ্ট অভাব অনটন।

ঠাকুর জননী কমলা দেবী যেন সত্যিকারের কমলাই ছিলেন। তিনি পিতা সদানন্দ ভট্টাচার্যের একমাত্র সন্তান ছিলেন। নাম যার সদানন্দ তাঁর কন্যাই তো সদানন্দ হবে।

সদা আনন্দের মধ্যে যার বসতি তিনিই তো—

"ধীর সমীরে যমুনার তীরে সতত বসতি বনমালী"

রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন।

এই সাধনার ফলে তিনি এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। একবেলা সাত্বিক আহার করতেন এবং তার পরিমাণ এত অল্প যে একটা শিশুর পক্ষেই তা উপযোগী।

এভাবে স্বল্পাহারে মানুষ কি ভাবে বাঁচে তা ভাবতে গেলে অবাক

লাগে। তবুও তিনি সুস্থ শরীরে সব কাজ কর্ম করতেন। তাঁকে এতটুকু ক্লান্ত লাগত না।

ঠাকুর জননী কমলা দেবী স্বামীর এই স্বল্পাহারে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। সবার স্ত্রী স্বামীকে কত কি ভালমন্দ পরিবেশন করে তুষ্ট করেন। তিনি কিছুই পারলেন না।

রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার মাছ মাংস কোনদিনই স্পর্শ করেন নি। একদিন কমলা দেবী মাছ রান্না করে অনেক অনুরোধ করে স্বামীকে খেতে দিয়েছিলেন কিন্তু মাছ খাওয়া তো দূরের কথা মুখের কাছে নিয়ে যেতেই এমন বমি শুরু করলেন যে তাঁর জীবন সংশয় হবার উপক্রম। কমলা দেবী মাথা চাপড়াতে লাগলেন কেন তিনি তাঁকে খেতে দিলেন। কয়েকবার বমি করবার পর তিনি একটু সুস্থ হলেন। এরপর কমলা দেবী তাঁর জীবদ্দশায় আর কোনদিন স্বামীকে খাওয়া নিয়ে জোরজুলুম করেন নি।

সাত্ত্বিক আহারই তো আহার।

যার যা আহার তা জিহ্বার পরিতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

যাঁরা সাধন ভজন করেন বা যাঁদের ঈশ্বরাভিমুখী মন তাঁদের আহার বিহারে বিমুখতা অনায়াসলব্ধ।

সাধক সর্বদাই চেতনানন্দ। জাগতিক সব কিছুর বাইরেই তাঁর বিচরণ। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এ বোধের বোধোদয় যাঁর হয়েছে তাঁর কাছে আহার বিহার সব কিছুই গৌণ, মুখ্য একমাত্র সেই পরম ব্রহ্ম স্মরণ।

অপরিসীম শক্তির অধিকারী রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার প্রচণ্ড শীতে পুকুরের নিদারুণ ঠাণ্ডা জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে জপ আহ্নিক করতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এতটুকু কষ্ট তাঁর হত না।

সদ গুরুর আশ্রয়ে থাকলে মানুষ এমনি শক্তিশালী হয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমানকালের গুরুতে আর অতীত কালের গুরুতে আকাশ

পাতাল ব্যবধান। এখন প্রকৃত গুরু বা শিষ্য মেলা খুবই দুষ্কর।

তাহলে কি দেশে গুরু বা শিষ্য কিছুই নেই!

নিশ্চয়ই আছে। সদগুরু জগদগুরু। গুরুই ভগবান, গুরু শিষ্যে একাত্মবোধই গুরুকরণের সার্থকতা। এই যে বিশ্বাস, এ বিশ্বাস মানুষের কোথায়? বিশ্বাস হারিয়ে মানুষ আজ সব হারিয়ে শব হয়ে আছে। এ মানুষের দেহের স্পন্দন আছে কিন্তু জীবনের স্পন্দন কোথায়, আত্মার স্পন্দন কোথায়!

রাধামাধবের গুরুদেব ছিলেন এক মহাশক্তিধর সাধক, মৃত্যুঞ্জয় ন্যায় পঞ্চানন। তিনি তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে এক মহাযোগী ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির মত হয়েছিলেন। রাধামাধবকে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিয়েছিলেন। তাই তিনিও হয়েছিলেন তেমনি শক্তিশালী। গুরু শিষ্য উভয়েই সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ভক্তির সন্ধান যিনি জেনেছেন তিনিই তো ভক্তির পাত্র।

মুক্তির সন্ধান যিনি জেনেছেন তিনিই তো শ্রদ্ধার পাত্র।

ভক্তি আর শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা আর ভক্তি। ঈশ্বর সমীপে যাবার এই দুই প্রধান সহায়। ভক্তি আর শ্রদ্ধার ভারে যে অবনত ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকেন না।

রাধামাধব একদিন আমাশা রোগে এমন ভাবে আক্রান্ত হলেন যে জীবন সংশয় হয়ে দাঁড়াল। চেষ্টার ত্রুটি নেই, সর্বতোভাবে চেষ্টা চলছে। কিন্তু কোন ভাবেই উপশম হয় না। কমলাদেবী ছোটাছুটি করছেন আর যে যা বলছেন তাই শুনছেন।

স্থিতপ্রাজ্ঞ সাধক রাধামাধব একমনে রোগশয্যায় শুয়ে গুরুর চরণ স্মরণ করছেন। এ ছাড়া আর কি করবেন। আর মনে মনে সবার অলক্ষ্যে জপ করছেন।

"গুরু ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুগুরুর্দেবো মহেশ্বর।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥".

অন্তর্যামী গুরুদেব ঠিক সেই সময় চলেছেন বিক্রমপুরে এক শিষ্যের

বাড়ি। সময় কম তাই একটু তাড়াতাড়ি যাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, তিনি কিছুতেই অগ্রসর হতে পারছেন না। এক অদৃশ্য শক্তি তাঁকে পিছন থেকে টেনে ধরছে। তিনি একটু দাঁড়ালেন। পরে আর ষ্টীমার ঘাটে না গিয়ে সোজা রাধামাধবের বাড়ি এসে উপস্থিত। রাধামাধব মনে মনে চেয়েছিলেন জীবনের শেষ দিনে গুরুর চরণে মাথা রেখে যেন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন।

সেই আশা পূরণ হল।

গুরুদেব তাঁর মস্তকে চরণ দুটো স্পর্শ করতেই জীবনের দীপ নিবে গেল। শ্রীগুরুপদে তিনি বিলীন হয়ে গেলেন।

গুরুকে ভজনা একেই বলে।

গুরুশিষ্য শত ব্যবধানে থাকলেও উভয় উভয়কে দেখতে পায়। একনিষ্ঠভাবে ঈশ্বর স্মরণ মনন করলে যে তাঁর কৃপা পাওয়া যায় এ প্রমাণ ভূরি ভূরি আছে শাস্ত্রে, পুরাণে, পুঁথিতে।

যে মানে সে জানে। যে জানে সে বোঝে। যে বোঝে সে খোঁজে। যে খোঁজে সে পায়!

এইতো ঈশ্বর প্রাপ্তিযোগ রহস্য। এর জন্য পুরাণ পুঁথি ঘাঁটতে হয় না। কোন কৃচ্ছসাধনের প্রয়োজন নেই।

খুঁজতে খুঁজতে সে সোজা হেঁটে চলে যেতে পারে ঈশ্বর চরণে। অজ্ঞানী হলেও তাঁকে পাওয়া যাবে। মূর্খ হলেও তাঁকে পাওয়া যাবে। দস্যু তস্করেও তাঁকে পায়।

মেহারের মূর্খ সর্বানন্দের মাতৃদর্শন হয়েছিল। নিরক্ষর রামকৃষ্ণও মাতৃসাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হয়েছিলেন। মাতাল জগাই মাধাইও মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের করুণালাভে নবজীবন লাভ করেছিলেন।

ঠাকুর জননী কমলাদেবী স্বামী বিহনে একটু স্তব্ধ হলেন কিন্তু বিচলিত হলেন না। তিনি জানেন এই পৃথিবীতে কেউ চিরকাল থাকতে আসে নি। একদিন না একদিন এই মাটির মায়া ছেড়ে তাকে যেতেই

হবে। কোন অর্থ, কোন পাণ্ডিত্য কোন কিছুই যাবার দিনে আটকাতে পারবে না।

পুণ্যবতী জননী কমলাদেবী ধর্মপ্রাণা ছিলেন। আমি সুখে থাকব, আমি ভাল খাব, পরব এ ধরনের তিনি ছিলেন না। অপরের দুঃখে তিনি এতই কাতর হতেন যে স্নানাহার ভুলে যেতেন। অপরের চোখের জলকে তিনি নিজের চোখের জল বলে মনে করতেন। কার ঘরে চাল নেই, কার পরনে বস্ত্র নেই, এ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন তাদের অভাব দূর করতে।

একালে অপরের সুখে সুখী হওয়া বড়ই শ্রমসাধ্য ব্যাপার। অপরের দুঃখে দুঃখ পাওয়াও তেমনি কষ্টকর। মানুষের মমত্ববোধের চরম অবক্ষয় চলেছে। কি সংসারে, কি বাইরে, সর্বত্রই আজ মানুষে মানুষে হাজার যোজন ব্যবধান। মানুষ তাই আজ আপন পরিমণ্ডলে একা। দেশ ও দশের এমন চরম অবস্থা ইতিপূর্বে আর কোনদিন আসে নি।

কমলাদেবী স্ত্রীলোক ছিলেন, কিন্তু তিনি আধুনিক স্ত্রীদের মত ঝগড়া কলহ হিংসা পরশ্রীকাতরতা জানতেন না। পরচর্চা পরনিন্দা পরছিদ্র অন্বেষণ তিনি কোনদিন করেন নি।

"সৎলোকে গুণ খোঁজে মধু খোঁজে ভ্রমরে।
মক্ষিকায় ক্ষত খোঁজে দোষ খোঁজে বর্বরে॥"

লেখাপড়া তিনি জানতেন না। কিন্তু যা শুনতেন তা ভুলতেন না। পুরান পুঁথির বহু শ্লোক তিনি শুনে শুনে কণ্ঠস্থ করেছিলেন। এই সতী-সাধ্বী রমণী স্বামীর মৃত্যুর কয়েক মাস বাদে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন।

আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত যত মহাপুরুষ অবতীর্ণ হয়েছেন প্রত্যেকেরই জন্মলগ্ন ও ক্ষণ অত্যন্ত শুভ ছিল। শুভলগ্ন ছাড়া এঁরা পৃথিবীতে আসেন না। যখন তাঁরা ভূমিষ্ট হন প্রকৃতিও যেন অপরূপ

সাজে সজ্জিত হয়ে তাঁদের প্রণাম জানায়। তাঁরা অসাধারণ হয়েই পৃথিবীতে আসেন—যদিও তাঁরা মানবশিশু হয়ে মায়ের ক্রোড়ে আসেন কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের আমরা মহামানবরূপেই প্রণাম করি।

শ্রীশ্রীরামঠাকুর ও ভাই লক্ষ্মণ একই সঙ্গে ভূমিষ্ট হন। লক্ষ্মণ ভূমিষ্ট হয়েছিলেন একটা মাংসপিণ্ডরূপে। সেই পিণ্ডে কোন স্পন্দন ছিল না। যিনি ধাত্রী ছিলেন তারই চেষ্টায় লক্ষ্মণ জীবন ফিরে পান ও ধীরে ধীরে মানবশিশুর আকৃতি ধারণ করেন।

যত মহাপুরুষ এসেছেন ইতিপূর্বে তাঁদের জন্মক্ষণ থেকে কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা দৃষ্ট হয়েছে। জন্মের পরই কেউ হয়ত শুধুই কেঁদেছেন। কেউ থামাতে পারে নি তাঁর ক্রন্দন, পরে হয়ত ভগবানের নাম কীর্তন শুনে ক্রন্দন থেমেছে। কেউ হয়ত জন্মানর পর এমন বর্ষণ হল যে সে বৎসর ভাল ফসল হল। কেউ হয়ত জন্মগ্রহণের পর দেখা গেল গৃহদেবতার মূর্তির মধ্যে শিশু যেন হাসছে। এমন ধারা আরও কত কি।

কিন্তু শ্রীঠাকুর একেবারে নির্বিকার। তিনি কোন কিছুই দেখালেন না। তিনি মানবশিশুরূপে এসেছেন। সেই মত আচার আচবণ করে লোকশিক্ষা ও লোকসেবার দ্বারা মানুষের সংসাবে বসবাস কবে পরমার্থের সন্ধান দিয়ে যাবেন।

পরবর্তীকালে তিনি ঠিক তাই করে গেছেন।

তিনি সাধারণ ভাবে বিচরণ করে অসাধারণকে কি ভাবে জানা যায় সেই কথা বলে গেছেন। কোন বাহ্যাড়ম্বর, কোন প্রচার, কোন অনুষ্ঠান তিনি পছন্দ করতেন না। সোজা পথে কি ভাবে চলা যায় তারই দিকনির্দেশ তিনি করে গেছেন।

ভগবানের কাছে যেতে হবে।

পথে ঘুরেও যাওয়া যায়। সিঁড়ি বেয়েও উঠে যাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সোজা পথ অর্থে শুধু নামগান করে তাঁর কাছে যাওয়া যায়।

নামের মধ্যেই তো নামীর স্থিতি।

তবে আর পুঁথিপত্র বগলে করে ঘুরে লাভ কি !

রামঠাকুর ধীরে ধীরে বয়সের দোলনায় দুলতে দুলতে বড় হচ্ছেন। আর পাঁচটা ছেলের মত খেলাধূলা করেন। ঠাকুর দেবতার মূর্তি দর্শন করে কাদামাটি দিয়ে দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করেন। স্নান করে শুদ্ধাচারে সেই সব মূর্তির পূজা করেন আবার সেই মূর্তির সামনে নৃত্য করেন।

এ যেন পাকা পুরোহিত।

ছেলেমানুষের এই পূজা দেখার জন্য কোন মানুষ ভিড় করে না। কেউবা দেখেও দেখে না। ভাবে ছেলেমানুষের এ এক খেলা। কিন্তু কে জানে এ পূজায় মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। এ পূজায় শুদ্ধভাব অবশ্যই বিরাজিত। রামঠাকুর মহানন্দে এই ভাবে বাল্যক্রীড়ায় মত্ত থাকেন। কখনও বনপথ দিয়ে ঘুরছেন। কখনও নদীর ধারে, কখনও গাছতলায়, কখনও ফসল ক্ষেতের মাঝে, কখনও নাম সংকীর্তনে। কখনও রামায়ণ গানের আসরে। কখনও কৃষ্ণযাত্রায়। কখনও হরির লুটে—এইভাবে তিনি মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ান।—

রামায়ণ গান শুনতে গিয়ে ভাবেন—

এ কি গানের কথা ! শুধু রাম আর লক্ষণের নামই তো করে চলেছে। এ ছাড়া বুঝি গান হয় না। আগাগোড়া শুধু রামচন্দ্রের কথা। শুধু রামচন্দ্রের কীর্তিকলাপ। সীতার বনবাস। রামরণেরাব যুদ্ধ। লক্ষণের শক্তিশেল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু রাম, আর রাম। রাম ছাড়া বুঝি এ পৃথিবীতে আর কিছু নেই !

রামায়ণ গান শুনে কত লোক কাঁদে। রামচন্দ্র সারাজীবন ধরে কত কষ্টই না করেছেন। তাঁর দুঃখে তাই বুঝি মানুষের মনপ্রাণ কাঁদে।

কাঁদতে গেলে রামের জন্য কাঁদাই ভাল।

এ কাঁদায় শোক নেই, তাপ নেই, কোন জ্বালা নেই।

আছে অপার আনন্দ, আছে অনাবিল শান্তি।

রামঠাকুরকে স্কুলে দেওয়া হল। ঠিক সময়ে আর দশটা ছেলের মত তিনি স্কুলে যান। কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁর মন বসে না। যেন ভাবটা এই রকম—

লেখাপড়া শিখে কি হবে। ওতে কি ভগবান দর্শন হয় নাকি! তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়?

এর চেয়ে পরম সত্য আর কি আছে! লেখাপড়া শিখে হয়ত পাশের পর পাশ করা যায় কিন্তু ভবপাশ থেকে মুক্ত হবার কোন পথ কি পাওয়া যায়! সৎ হয়ে ধর্মপথে কি চলা যায়?

কে জানে তাঁর মনে এই ধরনের কোন ভাব ছিল কি না—হয়ত এই কারণে লেখাপড়ায় তাঁর মন বসত না।

জীবনের দীর্ঘপথ পরিক্রমা শেষে বুঝতে পারছি যে যিনি সৃষ্টি স্থিতি লয়ের সন্ধান জানেন, যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি স্থিতপ্রাজ্ঞ, যিনি অব্যয় অক্ষয় তাঁর কি লেখাপড়ার কোন প্রয়োজন আছে?

তিনি নিজেই তো শিক্ষক।—তাঁকে আবার শেখাবে কে?

ঐ মহাজীবনের বিশদ বিবরণ কে দিতে পারে। কেই বা লিখে জানাতে পারে। কে বক্তৃতা দিয়ে শোনাতে পারে।

আমাদের এই ছোট্ট জীবনের মাপকাঠি দিয়ে তাঁর মহাজীবনের পরিমাপ কি করে করি।

বাল্যকাল থেকেই রামঠাকুরের এইসব খেলাধুলা, ভাবভঙ্গিমা দেখে কেউ কোনদিন বুঝতে পারেন নি যে এই শিশু একদিন জগৎ-পূজ্য মহাপুরুষ হবেন। তিনি যেন বাল্যকাল থেকেই নিরিবিলি নির্জনতাকে পছন্দ করতেন। আত্মপ্রকাশের চেয়ে আত্মগোপনের পথই তিনি বেছে নিয়েছিলেন।

কচ্ছপ যেমন হাত মুখ পা সব নির্মোকের ভিতরে লুকিয়ে রাখে রামঠাকুরও তেমনি সব কিছু গোপনে রাখতে ভালবাসতেন।

বাবা মা বা বয়স্করা বা তাঁর গুরুজন, তাঁদের যে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে হয় এ বোধ তাঁর শৈশব থেকেই ছিল। শৈশব থেকে এই যে ভক্তি

শ্রদ্ধার পাঠ শ্রবণ পরবর্তীকালে তা ঈশ্বরভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ভগবান নিজেই বলেছেন—

"শৈশব হইতে সদা আমারে ভজিবে।
বার্ধক্যে উচ্ছিষ্ট প্রেম কেন মোরে দিবে॥"

কাঁচা বাঁশকে নোয়ান যায় কিন্তু বাঁশ পেকে গেলে আর নোয়ান যায় না, তখন তা ভেঙে যায়। কাদামাটি দিয়ে যা খুশি তৈরি করা যায়। একবার পাখি, একবার হাতি—ভাল হল না আবার ঐ পাখি আর হাতি দলা করে তাল পাকিয়ে কালী মূর্তি তৈরি হয়ে গেল কিন্তু পাখিকে রোদ বা আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে আর হাতি ঘোড়া তৈরি করা যায় না।

আজকের মানুষের সে শিক্ষা কোথায় ?

তাই দেখা যায় হেলাফেলায় আমাদের দিন চলে যাচ্ছে—যা পেলে আর কিছু পাবার দরকার হয় না সে পরমবস্তু সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা আর করল কজন ?

বেলা যখন চলে গেল, অন্ধকারে যখন চারিদিক ঢেকে গেল তখন কি আর তাঁকে খুঁজলে পাওয়া যায়, না মেলে ?

রামঠাকুরকে এই সময় মাঝে মাঝে তন্ময় হতে দেখা যেত। তাঁর চোখ দুটো কি যেন খুঁজে বেড়ায়।

কেউ কেউ তাঁর এই ভাব লক্ষ্য করতেন আর মনে মনে ধারণা করতেন যে আজকের এই শিশু একদিন নিশ্চয়ই মহান সাধক হবেন। মহাপুরুষ হতে গেলে যে সব লক্ষণ থাকা দরকার সে সব লক্ষণ বুঝি তখন থেকেই প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর অবয়বে।

চারাগাছে কুঁড়ি ধরেছে।—

এখন তা ফুল হয়ে ফোটার অপেক্ষায় আছে।

যে একাগ্রতা, যে তিতিক্ষা, যে অধ্যবসায় ও ধৈর্য থাকলে মানুষ একদিন বড় হয় তার সব কিছুই রামঠকুরের মধ্যে ছিল সেই বাল্যকাল থেকে। ছোট্ট জলাধার থেকে তিনি ধীরে ধীরে বেগবান নদীতে রূপান্তরিত হচ্ছিলেন।

এমন দিন হয়ত আসছে যেদিন তিনি সব কিছু মালিন্য, সব কিছু কলুষতা ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবেন।

শ্যামাসঙ্গীত আর কার না ভাল লাগে। রামঠাকুর শ্যামাসঙ্গীত পরিবেশন হলে বুদ্ হয়ে যেতেন। তাঁর যেন কোন জ্ঞানই থাকত না। এমন গান যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা কি সাধারণ মানুষ না অসাধারণ, এমন গান একান্ত মাতৃভক্ত না হয়ে রচনা করতে পারে না। তিনিও গায়কের সুরে সুর মেলাতেন নিজের কণ্ঠে।

শ্যাম আর শ্যামার গান। মানুষেব জীবনের পতিত জমিতে চির-কাল ফসল ফলিয়ে যাচ্ছে। এ গানের বন্যায় মানুষ ভাসে আর ডোবে। ভেসে যদি কোনদিন যেতে হয় তবে এমন বন্যায় ভেসে যাওয়াই শ্রেয়। রামঠাকুর গানের সঙ্গে গান করেন আর হাততালি দেন।

সংসারের নিরানন্দ সাগরে এই তো আনন্দ।

এই তো সুখ। এই তো শান্তি।

রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার যখন দেহত্যাগ করলেন তখন রামঠাকুরের বয়স মাত্র নয় বছর। বাবাকে হারিয়ে রামঠাকুর একটু ভেঙে পড়লেন। তার কিছুদিন পর পিতার গুরুদেবও দেহত্যাগ করলেন।

রামঠাকুর এই সময় চিন্তা কবলেন।

এর নামই বুঝি সংসাব। মা বাবা ভাই বোন কেউই তাহলে চিরদিন থাকে না। একদিন না একদিন সবাই চলে যায়। চিরকাল যদি না থাকা যায় তাহলে এ দুদিনের সংসার পেতে মানুষ কষ্ট পায় কেন। চারিদিকে যা দৃশ্যমান সবই অনিত্য—সংসারের সবাই তাহলে অনিত্য বস্তুর কারবারী। যা থাকবে না সেখানে তাহলে মানুষ কোন নেশায় পড়ে থাকে। যাদের আপন বলে কাছে টানব একদিন যদি তারা ছেড়ে চলে যায় তাহলে এ সংসারের আর প্রয়োজন কিসের? তার চেয়ে বন-জঙ্গল পাহাড় পর্বত অনেক ভাল।

রামঠাকুরের মন ধীরে ধীরে বৈরাগী হতে থাকে।

মনও যেন বিবাগী হয়ে যেতে চায়।

ঠিক এই মুহূর্তে তিনি যেন সব বুঝে ফেললেন।

হবে না, হবে না, এখানে কোন কাজ হবে না।

এই সব বাড়ি, ঘর, পুকুর, দালান, ক্ষেত খামার কিছুই যদি না থাকে তাহলে এই ভুয়ো কাঁঠাল নিয়ে কি হবে।

রামঠাকুরের আর যেন কিছু ভাল লাগে না। কোন কিছুতেই তাঁর মন বসে না।

সঙ্গী সাথীরা ডাকতে এলে তিনি তাদের একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে ফিরিয়ে দেন। নয় বছরের বালক যেন নব্বই বছরের মানুষের মত জবুথবু হয়ে গেলেন। সব সময় একটা উদাস ভাব।

ঠিক এমনি সময় তাঁকে সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করা হয়।

দীক্ষিত হয়ে তিনি একমনে জপ আহ্নিকাদি কাজে মন দিলেন। জপ করছেন তো করছেনই কোনদিকে তাঁর খেয়াল নেই। আহ্নিক শুরু করলেন তো কত সময় কেটে গেল তাও তিনি জানেন না।

এই ভাবেই তাঁর দিন কাটে। দীক্ষিত হবার পর তিনি যেন একটা কাজ পেয়েছেন। জপতপেই তাঁর সময় চলে যায়।

কোথায় রইল তাঁর খেলাধূলা। কোথায় রইল তাঁর ঘোরাঘুরি।

তিনি যেন নিজেকে এক জায়গায় এনে প্রকৃতিস্থ হলেন।

এসব দেখে মনে হয় প্রদীপ জ্বালানোর আগে তাঁর সলতে পাকানো চলছে। মহাপুরুষ রূপ ধরবার আগে এমনি ধারা সলতে পাকানোর কাজ বুঝি সবাই করে থাকেন।

রামঠাকুর কৈশোরের সীমারেখা পার হয়ে ধীরে ধীরে যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত হলেন। দেহ মনের পটপরিবর্তন হয়। এই সময়

তিনি আরও শান্ত হয়ে যান। সব সময় তিনি যেন মনে মনে একটা গভীর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন।

কি সে সমস্যা—কেমন ভাবে তিনি তার সমাধান করছেন কে জানে !

তাঁর গুরুগম্ভীর মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে কেউ কিছু বলতে বা জিজ্ঞেস করতে সাহস করতেন না।

সাপ সাপই তা সে বাচ্চাই হক আর বড়ই হক।

দুজনেরই বিষ আছে। দুজনের দংশনেই মানুষের জীবন সংশয় হয়।

বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়, শৃগাল হয় না।

তন্ত্রসাধনার সিদ্ধক্ষেত্র যে মৃত্তিকা সেই মৃত্তিকায় রামঠাকুর অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি যে সাধারণ মানুষ হবেন না এতে আর সংশয় কোথায়। ঐ সাধনক্ষেত্র কর্ষিত হবার পর নতুন বীজ পড়েছে।

ফসল এবার হবেই।

রামঠাকুরের আহার ছিল যৎসামান্য।

ভাত ডাল তরিতরকারি রুটি কোনদিন তাঁকে খেতে দেখা যায় নি। মানুষ যে কি ভাবে দিনের পর দিন না খেয়ে বাঁচতে পারে তা ভেবে কোন কূলকিনারা মেলে না। রাতে তো কোনদিন কিছুই খেতেন না। ইচ্ছে হলে ঘিতে একটু চিনি দিয়ে তাই তিনি খেতেন। দিনে হয়তো সামান্য একটু কিছু ফল বা দুধ। পরবর্তীকালে এ খাওয়াও তাঁর ছিল না। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর তীরে যিনি বাস করছেন তাঁর বুঝি আর কোন আহারের প্রয়োজন নেই। নামামৃতসুধা যিনি অবিরাম পান করে চলেছেন তাঁর আবার ক্ষুধা কোথায় ?

আমাদের সংসার ক্ষুধার সংসার।

এখানে মাছ মাংস দই দুধ ছানা, আনাজ সবই প্রয়োজন।

সবাই যেন দিনরাত হা করে বসে আছে ক্ষুধার জ্বালায়।

মানুষ এই খাদ্য সংগ্রহ করতে করতেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়াচ্ছে ক্ষুধার

জ্বালায়। কিন্তু যে খাবার খেলে আর ক্ষিধে পায় না, সে খাবার কে চায় আর কেইবা সন্ধান দেয়।

সে খাদ্য ঈশ্বরের নাম, সে খাদ্য ঈশ্বরের ধ্যান।

মানুষের আছে পেটের জ্বালা।

স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষদের আছে হৃদয়ের জ্বালা।

সে হৃদয়ের জ্বালা কি?

সে জ্বালা—হে প্রভু হৃদয় মন্দিরে আসন পেতে রেখেছি—তুমি এস, অদর্শনের জ্বালা যে আর সহ্য হয় না। এ পরমার্থিক ক্ষুধা আমার দূর কর। আমাকে চরণে আশ্রয় দাও।

রামঠাকুর একদিন রাতে সিদ্ধমন্ত্র পেয়ে গেলেন এক মহাপুরুষের কাছ থেকে। স্বপ্নে তিনি দর্শন পেলেন সেই মহাতেজা, দীর্ঘদেহী, জটাজুট সম্বলিত মহাপুরুষকে। দুচোখে তাঁর শতচন্দ্রের দীপ্তি, প্রস্ফুটিত কমলের মত চওড়া ললাট, সারা অঙ্গে লাবণ্যের জ্যোতি। রামঠাকুর স্বপ্নে প্রণাম করলেন। তিনি মন্ত্র দিয়ে অন্তর্হিত হলেন।

রামঠাকুর জানেন তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি হয়ত এতক্ষণ হাজার হাজার যোজন দূরে চলে গেছেন। মন্ত্র জপ করতে করতে স্বপ্নের রাত পোহাল। পূবের আকাশে রক্তিম আভা। মধুপের গুঞ্জরণে পত্রপুষ্প মোহিত। নীড়ের পাখি ঘর ছেড়ে উড়ে চলে দূর আকাশে।

সূর্য উঠল পূর্ব দিকচক্রবালে।

আবার গোধূলি আকাশে সূর্য অস্ত যাবে—চন্দ্রোদয় হবে আকাশ আলো করে।

মানুষের কাছে একটা দিনের পরিক্রমা শেষ হবে।

দিনের চলে যাওয়া তো নয়, প্রতিদিন একটা করে আয়ুর ফুল ঝরে পড়ে। ঐ চন্দ্র সূর্য যেন শব্দহীন বলে যায়—ওরে দিন চলে যায়। আমাদের যিনি নিয়ন্ত্রিত করছেন তাঁর একবার সন্ধান নিতে দোষ কি। সন্ধান ঠিকমত নিতে পারলে মিলে যাবে সেই পরম মঙ্গলময়কে।

রামঠাকুর স্কুলে লেখাপড়া শিখে অবশ্য জ্ঞানী হন নি। যে কদিন স্কুলে পাঠ নিয়েছিলেন তাতেই মনে হয় তিনি সর্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়েছিলেন।

জ্ঞানী কে?

ঈশ্বরমুখী মন যার সেই তো জ্ঞানী।

ঈশ্বর বিশ্বাস যার নেই সেই তো অজ্ঞানী।

সংসারে অভাব অনটন চিরকালই ছিল। আজও আছে। থাকবে যতদিন সমাজ থাকবে। বাজারদরের হেরফেরে এর শেষ নেই।

রামঠাকুরের বয়স যখন চোদ্দ বছর তখন তাঁর সাংসারিক দুরবস্থা চরমে ওঠায় তাঁকে জীবিকার প্রয়োজনে বাইরে বের হতে হয়েছিল। কিন্তু ঘর যাঁকে বাঁধতে পারে নি তিনি কি কোন ঘরে বাঁধা থাকেন। তিনি যে হঠাৎ একদিন কোথায় গেলেন তা কেউ জানল না।

মণিহারা স্বর্গের মত ডিঙামানিক রইল পড়ে।

আগেকার দিনে আজকের মত রেলপথ বা বাস পথ ছিল না। পথ-ঘাটও তেমন ছিল না। তখন অনেক সাধু সন্ন্যাসী পায়ে হেঁটে বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী যাতায়াত করেছেন। গৃহী মানুষকেও এখানে ওখানে যেতে হলে পায়ে হেঁটেই চলাফেরা করতে হয়েছে। তা সে এক মাইলই হক বা একশ মাইলই হক। পথশ্রম ছাড়াও সে সময় দস্যু-তস্করেরও ভয় ছিল। তাছাড়া ছিল হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ। পথে বেরিয়েই কত মানুষ তাদের হাতেই শেষ হয়েছে।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবও শান্তিপুর থেকে পায়ে হেঁটে নীলাচল গিয়েছিলেন। রামঠাকুর পদব্রজে নিদারুণ বিপদসঙ্কুল পথে গুরু মন্ত্র জপ করতে করতে কামাখ্যা গিয়ে পৌঁছলেন। নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে, অনশনে অনিদ্রায় কাতর হয়ে তিনি পথ হেঁটেছেন। যে বয়সে ছেলেরা খেলাধূলা করে দিন কাটায়, সে বয়সে তিনি সর্বভয়কে দূর করে, সব আশঙ্কাকে তুচ্ছ করে কামাখ্যার মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কোথায় ডিঙামানিক আর কোথায় কামাখ্যা। কতখানি ভগবান কৃপা থাকলে তবে ঐ বয়সে দীর্ঘদিন পদব্রজে হেঁটে এসে পৌঁছান যায়।

ভগবদকৃপাই হচ্ছে আসল মূলধন।

একদিন তিনি একাগ্র চিত্তে ধ্যান জপে রত। এমনভাবে ধ্যানাচ্ছন্ন যে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিও তাঁর কর্ণকুহরে পৌঁছচ্ছে না।

এমন সময় শুনতে পেলেন বাইরে থেকে কে যেন তাঁকে নাম ধরে ডাকছেন। এখানে কে তাঁকে নাম ধরে ডাকতে পারে, ঠাকুর কিছুই বুঝতে পারছেন না। চমকে তিনি উঠে দাঁড়ান।

আবার সেই ডাক—'রামচন্দ্র।'

এবার সোজা বাইরে এসে চমকে যান—ইনি কে। এইতো তিনি, যিনি কিছুদিন পূর্বে ডিঙামানিকে তাঁকে স্বপ্নে মন্ত্র দিয়েছিলেন।

আছাড় খেয়ে তাঁর পায়ের ওপর পড়লেন রামঠাকুর।

মহাপুরুষ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করে বললেন, 'এস আমার সঙ্গে।'

রামঠাকুর মন্ত্রবৎ তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন। কোথায় তিনি চলেছেন তাও জানেন না। কি পাবেন তাও জানেন না। শুধু বুঝলেন যে এই মহাপুরুষ তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের দিগদর্শক।

তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলেন তাঁর কাছে।

আত্মসমর্পণ আর আত্মনিবেদন। যে পরিপূর্ণভাবে করতে পারে সেও ধীরে ধীরে পূর্ণ হতে থাকে। শূন্যতা আর তার থাকে না।

রামঠাকুর তো পূর্ণকুম্ভ। এখন আর তাঁর কোন সাড়া শব্দ মেলে না। তিনি শান্ত. স্থির, নীরব। পূর্ণ না হলে এ ভাব আসে না।

দেবতাত্মা হিমালয়ের এক নিভৃত স্থানে রামঠাকুর তাঁর সাথে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে রামঠাকুর পরম বিস্ময়ে দেখলেন যে ছয়জন বিরাট বপু সম্পন্ন মহর্ষিতুল্য মানুষ ছটি আসনে বসে আছেন। তাঁরা সবাই ধ্যানস্থ ও সমাধিস্থ। তাঁদের একপাশে পড়ে থাকা একটা শূন্য আসনে তিনি ঠাকুরকে বসতে বললেন। কিন্তু ঠাকুর তো বন্ধন মুক্ত নয় তাই তিনি সে আসনে বসতে পারলেন না।

গুরুদেব তাঁকে বললেন, 'তোমাকে হিমালয়ের এই নিভৃত স্থানে

ভগবান অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে আরাধনায় বসতে হবে না। লোকালয়ে তোমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তারা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমি তাদের দ্বারে দ্বারে করাঘাত করে জানিয়ে দাও প্রকৃত শান্তির পথ সন্ধান। তাদের সেবাই হবে তোমার জীবনের ব্রত। বড় দুঃখকষ্ট তাদের। তাদের অশান্তির মাঝে তুমি শান্তির প্রলেপ দাও। এই ব্রত উদ্‌যাপন করলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। যাও কোন ভয় নেই। আমাকে যখনই স্মরণ করবে তখনই পাবে। আশীর্বাদ করি তুমি জয়ী হও। পথে কোথাও অপেক্ষা করবে না।

হিমালয় দেবদেবতার লীলাক্ষেত্র। সাধক-সাধিকার সাধনক্ষেত্র এমন নিভৃত স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ! হিমালয় শুধু পাহাড় নয়—সারা ভারতবর্ষের সাধন ও সিদ্ধপীঠ। যুগে যুগে কালে কালে কত না মহাপুরুষ এখানে এসে নীরব সাধনার দ্বারা ঈশ্বর দর্শন করেছেন। সাধন মার্গের উচ্চশীর্ষে উঠেছেন তা ভারতবর্ষের ধর্মপ্রবণ মানুষ কিছু কিছু অবশ্যই জানেন।

গুরুদেবের কৃপায় রামঠাকুর হিমালয়ের অনেক কিছু দর্শন করে ধন্য হয়েছেন। কত দুর্লভ জিনিস তিনি দেখেছেন তার কোন হিসাব নেই। হিমালয়ের দুর্গম গিরিবর্ত্মে—যেখানে কোন মানুষ যাতায়াত করতে পারে না, কোন জীবজন্তু যেখানে বিচরণ করে না, কোন পাখিও যেখানে সচরাচর দৃষ্ট হয় না সেখানে গিয়ে রামঠাকুর দেখেছেন কত সাধু যোগী কতকাল থেকে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। প্রস্তরবৎ, দেহে কোন প্রাণ আছে কিনা বোঝা যায় না। দুই চক্ষু মুদিত, প্রশস্ত দেহী।

রামঠাকুর পাহাড় থেকে পত্রপুষ্প সংগ্রহ করে এনে তাঁদের দেবতা জ্ঞানে পূজা করেছেনে। ফলমূল যতটুকু পেরেছেন তাই দিয়ে ভোগ নিবেদন করেছেন। সে ভোগ তাঁরা গ্রহণ করেছেন।

রামঠাকুর বিদায়কালে তাঁদের ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

তাঁরাও হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন।

তাঁর পথচলার যেন বিরাম নেই। এসেছিলেন কামাখ্যা, সেখান থেকে কৈলাস, তিব্বত, হিমালয়ের গহন কন্দরে, তুষারমৌলী পর্বতের গিরিগহ্বরে, কোনো সময় নিদারুণ ঝড়ের কবলে পড়ে কোন গুহায় হয়ত আশ্রয় নিয়েছেন, কোন সময় হয়ত অবিরাম তুষারপাতের দাপটে কাবু হয়েছেন। কত সময় পাহাড়ের শীর্ণ পথে চলতে চলতে পা পিছলে পড়ে যেতে যেতে জীবন ফিরে পেয়েছেন।

তিনি দুচোখ ভরে দেখেছেন কত বিচিত্র সাধু সন্ন্যাসী। কত অত্যাশ্চার্য মহাজ্ঞানী। কত নিরভিমান যোগী। যাদের সর্বাঙ্গে তুষারপাত হচ্ছে অবিরাম অথচ তাঁরা ধ্যানগম্ভীর, এতটুকু বিচলিত নয়। কি ভয়ঙ্কর, কি সাংঘাতিক সাধন-প্রণালী, যা দেখলে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

রামঠাকুর চলেছেন শুধু চলেছেন। যেন এক তীর্থপথিক তিনি। পরনে একখানা বস্ত্র, তাও জায়গায় জায়গার ছিন্নভিন্ন। কোন খেয়ালই তাঁর নেই। তিনি যেন সারা হিমালয়কে দেখতে চান। জানতে চান, বুঝতে চান। দেবদেবতার বিচরণভূমি হিমালয়ে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে কেউ কেউ ঈশ্বরকে দর্শন করতে পারেন।

চলতে চলতে রামঠাকুর আবার এসে থামলেন এক জায়গায়। চারিদিক জনমানবহীন—এক নিরালা গুহার সামনে এসে দেখেন এক বৃদ্ধ জ্ঞানতাপস একটা ধুনী জ্বালিয়ে বসে আছেন। প্রজ্বলিত ধুনীর হোমশিখায় বেশ একটা উষ্ণতা অনুভব হচ্ছে।

তিনি অবাক বিস্ময়ে দেখলেন একটা সাপ এসে ধুনীকে প্রদক্ষিণ করে তাপসপ্রবরের কাছে যেতেই তিনি তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করলেন। সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে গেলে সেই ঝলসানো দেহটা ঠাণ্ডা করে সম্পুর্ণ খেয়ে ফেললেন। পরে তাঁর দেহ বড় হতে হতে একটা শব্দ করে ফেটে যেতেই তার ভেতর থেকে একটা দিব্যকান্তি অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী বের হয়ে ঐ দেহটাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করে চিমটা কমুণ্ডল হাতে নিয়ে সোজা পাহাড়ী পথ বেয়ে অন্তর্হিত হলেন।

এমন সময় গুরুদেব অনঙ্গদেব উপস্থিত হয়ে রামঠাকুরকে বললেন, 'চমকে যেও না, মহাপুরুষরা এইভাবে কায়া পরিবর্তন করেন।'

রামঠাকুর দিনের পর দিন পাহাড়ে পাহাড়ে পথ পরিক্রমা করে চলেছেন। গুরুদেব ও একজন গুরুভ্রাতা সঙ্গে আছেন। রামঠাকুরের এমন কিছু বয়স হয় নি যে এত ধকল সহ্য করবেন। তুষারাবৃত বর্ষণ-ভরা দুর্গম পাহাড়ী পথে এবার সত্যই তিনি অবসন্ন হয়ে পড়লেন, আর চলার শক্তি থাকল না। গুরুদেব তাকে ধরে কোনমতে পাহাড়ের সমতল ভূমিতে নিয়ে এলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলা শুরু হল। পথে কত সাধু যোগী তাঁদের দর্শন হল।

পথ চলতে চলতে প্রায়ই রামঠাকুর ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। তিনি ভাবছেন, তাইতো গুরু এত কৃপা করছেন কিন্তু কই গুরুসেবা তিনি তো করতে পারছেন না, এত কাছে পেয়েও তাঁর গুরু পরিচর্যা হল না।

তিনি পাহাড়ে ফলমূলের সন্ধানে বের হলেন। কিন্তু এই কঠিন প্রান্তরের মাঝে কোথায় পাবেন ফলবান বৃক্ষ। এদিক ওদিক চারিদিক সন্ধান করে কোনখানে বৃক্ষের খোঁজ না পেয়ে তিনি বিষণ্ন মনে এক জায়গায় বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর সবিস্ময়ে দেখলেন সামনে এক জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি।

তিনি ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করতেই মূর্তি তাঁর হাতে একটা সুপক্ক ফল দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতে ভাবতে গুরুসমীপে এসে সব কিছু ব্যক্ত করে গুরুদেবের সেবা মানসে ফলটি তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন।

গুরুদেব বললেন, 'ওটা তোমার, তুমি খাও।' রামঠাকুর আনন্দ সহকারে ফলটি আহার করলেন।

এসব ঘটনা শুনলে নাস্তিক যারা, তারা কোনমতেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ঈশ্বরকৃপা কখন কি ভাবে আসে তা কি কেউ বলতে পারে ? দয়ালঠাকুর রামচন্দ্র ঈশ্বরবিশ্বাসী বলে এ কৃপা তাঁর সহজলভ্য হল।

ঈশ্বরের বিশ্বাস না থাকলে হয় না।

নাস্তিক সেই, যে নিজেকে নিজে বিশ্বাস করে না।

কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক ঈশ্বরের কিছু আসে যায় না। চিরকাল এক একটা সময় এক একজন মহাপুরুষ এসেছেন ঈশ্বরের প্রেরিত প্রতিনিধি হয়ে। মানুষের মাঝে, মানুষের বেশে, মানুষের দুঃখকষ্ট মোচনের জন্য।

যাঁরা অবাধ্য তাঁরা বদ্ধ হয়েছেন। বাধ্য হয়েছেন সংসার অরণ্যে। যারা বিশ্বাস করেন নি তারা জীবদ্দশায় এতটুকু শান্তি পান নি। অনাঘ্রাত ফুলের মত তাঁরা একদিন ঝরে পড়েছেন।

মানুষ রামঠাকুর এসেছিলেন মানুষের বেশে। মানুষকে শান্তির পথ দেখাতে। ত্রিতাপ জ্বালা থেকে তাদের মুক্তি দিতে। 'মুক্তি' মানুষের করতলগত এই বোধ জাগাতেই তাঁর আগমন।

রামঠাকুর গুরুদেব ও গুরুভ্রাতা সহ আবার এক পর্বতগুহায় এসে উপস্থিত হলেন। দেখা গেল ঐখানে আরও কয়েকজন যোগী তপস্যারত। তাঁদের পাশে একটা শূন্য আসনে গুরুদেব রামঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলেন।

রামঠাকুরের সাধনা শুরু হল। কত বছর যে কেটে গেল তা কে জানে। কেউ তার হিসাব রাখে নি। কত ঝড় বয়ে গেছে, কত তুষারপাত হয়ে গেছে, কত রৌদ্র ঝিলিমিলি দিন কেটে গেছে তাও কেউ জানে না।

একাগ্রতা ও তন্ময়তার যে সাধনা তাতে জাগতিক কোন কিছুরই খেয়াল থাকে না—সব বিস্মরণ হয়ে যায়।

রামঠাকুরের সাধন জীবনের শেষ পর্যায় যখন উপস্থিত তখন তাঁর কাছে এক গুরুভ্রাতা ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। গুরুভ্রাতার গলায় একখণ্ড শিলা দোদুল্যমান।

সাধন জীবনের শেষ সীমায় এসে তিনি শেষ অঙ্কের, শেষ দৃশ্যের কিছুতেই যবনিকাপাত করতে পারছেন না।

কেন পারছেন না তা তিনি কিছুতেই বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন না। চারিদিকে তাঁর চোখের দৃষ্টি কিন্তু কেউ তো কোথাও নেই। তবে কি হবে! তীরে এসে বুঝি তরী ডোবে! কিন্তু তা কি হয় - একান্ত ভাবের যে সাধনা তার সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত। হঠাৎ গুরুদেব আবির্ভুত হলেন এই সঙ্কট মুহূর্তে। তাঁর কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'রামচন্দ্র এইবার তুমি পূর্ণাহুতি দাও, তোমার সাধন এখানেই শেষ।'

পূর্ণাহুতি দেবার পর যজ্ঞের কুণ্ডের অগ্নিশিখা মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। পুরনো রামচন্দ্র হারিয়ে গেলেন। নতুন ভাবে জন্ম নিলেন মহাসাধক শ্রীশ্রীরামঠাকুর। গুরুদেব তাঁকে লোকালয়ে ফিরে যাবার আদেশ দিয়ে বিদায় দিতে মনস্থ করলেন।

যে গুরুভ্রাতার কণ্ঠে নারায়ণ শিলা ছিল তিনি তা খুলে রামঠাকুরকে বললেন, 'ভাই রামচন্দ্র, গুরুর নির্দেশেই এ শিলার ভার তোমাকে নিতে হবে। এতদিন উনি আমার কাছে ছিলেন, এবার আমি ভারমুক্ত। এ শিলার কাহিনী আদ্যপান্ত তুমি জান। তুমি ছাড়া এ শিলার ভার আর কে নেবে। আজ থেকে এ শিলার সেবা-পূজার ভার তোমার উপর রইল। গুরুদেব শিষ্যসহ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন। রামঠাকুর চারিদিক চেয়ে দেখলেন কেউ নেই। কণ্ঠে তার ঝুলছে নারায়ণ শিলা। পথ প্রদর্শন স্বরূপ যার সঙ্গে ভগবান বিদ্যমান তাঁর আবার শঙ্কা কোথায়। রামঠাকুর ভাবছেন এ কি কঠিন দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ল। এ শিলার নিত্য ভোগ তিনি কি ভাবে দেবেন। শিলার আদ্যপান্ত তিনি জানেন সবই, একথা মিথ্যা নয়। শিলাটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিথি ঠিক করা যায়। পূর্ণিমার দিন শিলাটির চতুর্দিক আলোকিত হয়ে শুভ্রবর্ণ ধারণ করে আবার অমাবস্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। আশ্চর্য এই শিলা! ঈশ্বরের কি অপরূপ মহিমা। নিজেই নিজের স্বরূপ কৃপা করে দর্শন করাচ্ছেন। দর্শন করছেন কে? এক ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞানতাপস আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ রামঠাকুর। পরবর্তীকালে

রামঠাকুর এই নারায়ণ শিলা সম্বন্ধে স্বমুখে ভক্তজন সমক্ষে নানা ঘটনা-প্রবাহ ব্যক্ত করছেন যা ইতিহাসের মতই ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ।

ঠাকুর শিলা কণ্ঠে ঝুলিয়ে চলেছেন লোকালয়ের উদ্দেশ্যে। বেশ কয়েক দিন পাহাড়, পর্বত, ঘন অরণ্য পার হয়ে এক রাজার রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন। অনেক কষ্টে রাজ সমীপে হাজির হয়ে রাজাকে অনুরোধ করলেন শিলাটির ভার নিতে। কিন্তু রাজা ইন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত বিনীত ভাবে তাঁর অক্ষমতা জানালেন।

রামঠাকুর অত্যন্ত চিন্তিত মনে আবার পথ হাঁটতে লাগলেন। ভাবছেন মনে মনে, তবে কি এ শিলার ভার 'কেউ নেবে না? এর সেবা পূজা তিনিই বা কি ভাবে করবেন! কে বলে দেবে, কে তাঁকে আশ্বস্ত করবে এই দুশ্চিন্তা থেকে। রামঠাকুরের দুচোখে জলের ধারা। চোখের জলের ফোটা ছড়িয়ে তিনি সামনের পথ এগিয়ে চলেছেন। তাঁর সেই চোখের জলে কণ্ঠলগ্ন নারায়ণ স্নান করছে। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। নারায়ণ অভুক্ত রয়েছেন। এ উপবাসী নারায়ণ শিলার জন্য তিনি কি ভাবে ভোগের ব্যবস্থা করবেন। এই কঠিন প্রস্তরসদৃশ মাটিতে কি গাছগাছড়া জন্মায় না। চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে দুচারটে গাছ দেখতে পেলেন তিনি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে একটা গাছের ডাল ভেঙে ফেলতেই দুধের মত কি যেন টপ্ টপ্ করে পড়তে শুরু করল। পাতার উপর দুধ সংগ্রহ করে ঐ শিলাকে স্নান করিয়ে ভাবলেন এখন কি দিয়ে তাঁর ভোগ দেওয়া যায়। পরক্ষণেই সামনে চেয়ে দেখেন দূরে কি একটা গাছে কয়েকটা ফল ঝুলছে। তিনি অনেক কষ্টে দুতিনটে ফল সংগ্রহ করে এনে তাই দিয়েই শিলার ভোগ দিলেন। নিজেও প্রসাদ পেলেন।

আবার অরণ্যের মাঝে পথ পরিক্রমা। এবার গাছগাছড়া প্রচুর দেখতে পেলেন। কত রকমের গাছ। কোন গাছের ডালে এমন কাঁটা যে পথ চলতে চলতে তাঁর শরীরের কিছু অংশ ছড়ে গিয়ে জ্বলতে শুরু করল। জ্বলুনি যেন থামে না—হাতের কাছে কিছু না পেয়ে

জ্বলুনির জায়গায় শিলাটি চেপে ধরেন আর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অদ্ভুত কাণ্ড।

ভক্তের ভগবান, তিনি ভক্তের কষ্ট কি করে সহ্য করেন তাই নিজেই যেন ভক্তের ব্যথা উপশমের ব্যবস্থা করে দিলেন তাঁর স্পর্শ দিয়ে। ব্যথা বেদনা, শোক যন্ত্রণা তিনিই দিচ্ছেন আবার তিনিই বৈদ্য হয়ে সব সারিয়ে তুলছেন।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। রামঠাকুর পড়লেন মহাবিপদে। এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঘন তমিস্রার আস্তরণ পাতা রাতে তিনি কোথায় যাবেন? কে তাঁকে আশ্রয় দেবে! এস্থল জনমানবশূন্য। অন্ধকার পথেই তিনি চলেছেন।

মনে এই ভাব—তিনি তো একা নন। সঙ্গে আরও একজন আছেন যিনি সর্বভয়হারী, যিনি সর্বসিদ্ধিদাতা। যিনি অকূলের কাণ্ডারী, দেখি না কি হয়।

যেমন বিশ্বাস তেমনি ফল।

বিশ্বাস করতে জানলে প্রতি নিশ্বাসে তাঁর স্থিতি অবশ্যই অনুভব করা যায়। চারদিকে অন্ধকার। এই রাতের অন্ধকার ভেঙে এগোচ্ছেন। আজ দুজনকেই উপবাসী থাকতে হবে। এছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

অন্ধকারে কে যেন আসছে! তার চোখ দুটো জ্বলছে।

তিনি থমকে দাঁড়ালেন। একটা বাঘ এসে রামঠাকুরের চারদিক ঘুরে তাঁর পায়ের কাছে বসে লেজ নাড়িয়ে চলে গেল। ঠিক তার পরমুহূর্তেই আর একটা বাঘ এসে তাঁর সামনে দাঁড়াতেই রামঠাকুর তার দিকে তাকানো মাত্রই সে চলে গেল।

রক্তপায়ী হিংস্র বাঘও পথ ছেড়ে দেয় যদি এই বিশ্বাস থাকে যে রক্ষাকর্তা ভগবান, তিনি রাখলে কে মারতে পারে।

বিষধর সর্পও ফোঁস ফোঁস করতে করতে এসে অন্য পথে চলে যায়।

তিনি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এমন জায়গা যে নিজেও

একটু বিশ্রাম নিতে পারছেন না আবার শিলাটিকে নামাতেও পারছেন না। শরীর তাঁর অবসন্ন, ক্লান্ত। একটু তন্দ্রা আসায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। রাত তখন তৃতীয় প্রহর।

ঘুম ভাঙতেই উঠে আবার হাঁটা শুরু করলেন।

লোকালয়ে না পৌঁছাতে পারলে তাঁর ভাগ্যে কি আছে কে জানে। যেতে যেতে আবছা অন্ধকারে অনেক দূরে অট্টালিকার মত কি যেন একটা দেখতে পেলেন। উৎসাহ ভরে তাড়াতাড়ি কাছে যেতেই দেখলেন একটা রাজপ্রাসাদ।

রাত তখনও শেষ হয় নি। মনে হয় ভোর হতে আর বেশি দেরী নেই। তিনি সোজা প্রাসাদে ঢুকে একেবারে রাজার প্রমোদ কক্ষে উপস্থিত হলেন। রাজা তখন নর্তকীদের নিয়ে প্রমোদ সাগরে ডুবে আছেন। চারদিকে মদিরার গন্ধ।

রাজার দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়তেই তিনি সাপের মত ফুঁসে উঠলেন। বললেন, 'কে ওখানে ? কেমন করে ঐ লোকটা প্রমোদ কক্ষে ঢুকল ?'

রামঠাকুর রাজার কাছে অনুনয় করে বললেন, 'আপনি এই নারায়ণ শিলাটির ভার নিয়ে আমাকে দায়মুক্ত করুন।'

রাজা ক্রোধে ফেটে পড়লেন, 'চালাকির আর জায়গা পাও নি। এই কে আছিস, এই ব্রাহ্মণকে গলাধাক্কা দিয়ে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে ছেড়ে দিয়ে আয় যাতে আজই ও বাঘের পেটে যায়।'

রাজকর্মচারী আদেশ মত রামঠাকুরকে যতপরনাস্তি লাঞ্ছনা গঞ্জনা করল। তিনি নির্বিকারে সব সহ্য করলেন।

সারা দিনরাত তিনি ও নারায়ণ উপবাসী। এখন কি করবেন আর না করবেন, তিনি যে ভেবেই পাচ্ছেন না।

সাধরাণ ধারণায় এটাই মনে আসে স্বয়ং নারায়ণ যার কণ্ঠে শিলা রূপে অবস্থান করছেন, তাঁর এই দুর্গতি কেন ? তিনি কি অন্ধ ? তিনি

কি নির্মম ? দেখেও কিছু দেখছেন না। শুনেও কিছু শুনছেন না—এ কোন ধরনের ঈশ্বর মহিমা। ঈশ্বর ঈশ্বর করে যাঁরা দিনরাত ডাকছেন, কাঁদছেন তাঁদের কি তিনি বিপদগ্রস্থ করেন ? তাহলে ঈশ্বরকে কি আর কেউ ডাকবে ? না তাঁর মহিমা থাকবে এ পৃথিবীতে ? এর উত্তর ভগবানই দিয়ে রেখেছেন :

"যে করে আমার আশ
তার করি সর্বনাশ
যে ছাড়ে না আমার পাশ
তার হই আমি দাসের দাস"

আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনার ভিতর দিয়ে তাঁর কৃপা বোধগম্য হয় না। কিন্তু ঈশ্বরকে বোঝা কি এতই সোজা ? তাঁর যে অমোঘ বিধান। তাঁর কৃপায় কুঁড়ি ফুল হয়ে ফোটে অন্ধকার রজনী শেষে।

রামঠাকুরকে রাজকর্মচারীরা সারাদিন কষ্ট দিয়ে সন্ধ্যার পূর্বে এক গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এলেন। তিনিও মনে মনে ঠিক করলেন যাঁকে ধাবণ করে এত দুর্ভোগ তাঁর ভার তিনি কি ভাবে নেবেন—এ তাঁর সাধ্যের বাইবে। রাত্রি ভোর হলেই তিনি এই নারায়ণ শিলাকে এখানে রেখে প্রস্থান করবেন। নিজের ভার তিনি নিজেই নেবেন।

তিনি একটা পাতার উপর নারায়ণ শিলাকে রেখে তাব পাশেই শুয়ে পড়লেন—সর্বাঙ্গে তাঁর অসহনীয় বেদনা। ক্লান্তিতে তাঁর আর এক পা অগ্রসর হবার শক্তি নেই। এক সময় তিনি গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার রাত্রি।

এই অন্ধকার ছড়ানো রাতের কোলে তিনি ও শিলা নিদ্রিত। এপাশে ওপাশে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে, নিশাচর পাখির পাখা ঝাপটানি, শিরশিরে বাতাসে, মাঝে মাঝে ঝিরঝির বর্ষণ। রামঠাকুর গভীর ঘুমে অচেতন।

শেষরাতে বনের মধ্যে হুড়মুড় শব্দে রামঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ হল। তিনি দেখলেন চারদিকে মশালের আলো। তিনি বুঝে নিলেন এ

ঠিক ডাকাতের দল। আজ আর তাঁর কোন রক্ষা নেই। তাড়াতাড়ি নারায়ণ শিলাকে আবার কণ্ঠে ধারণ করলেন।

এ অন্ধকারে তিনি যাবেনই বা কোথায়!

চেঁচামেচি হৈ চৈ আরও কাছে এগিয়ে এল।

কে যেন চীৎকার করে উঠল, 'এই তো এই পথে এসে লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে গেলাম।'

আবার কে যেন বললে, 'ভাল করে খুঁজে দেখ, কোথায় গেল? লোকটাকে না পেলে তোমাদের সব গর্দান নেব। 'রামঠাকুর নারায়ণ শিলাকে বুকে চেপে ধরে অশ্রু বিসর্জন করছেন। এমন সময় রাজা-সমেত কর্মচারীরা দল বেঁধে এসে তাঁকে ঘিরে ফেলল।

রাজা এসে রামঠাকুরের পায় ধরে বললেন, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। চলুন আমার রাজ্যে, সেখানে এই নারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠা করে তার উপর একটা মন্দির করে দেব, আপনি ঐ শিলার সেবাপূজার ভার নিয়ে আমার রাজ্যেই থাকবেন।'

রামঠাকুর চমকিত। হতবাক। তিনি তো কিছুই বুঝতে পারছেন না।

গলাধাক্কা দিয়ে যাঁকে কিছুক্ষণ আগে তাড়িয়ে দিয়েছে সেই রাজা আবার তাঁকে পায়ে ধরে ফিরিয়ে নিতে এসেছে।

রামঠাকুর ইতস্ততঃ করছেন দেখে রাজা বললেন, 'প্রভু আমার রানী রাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন যে এ নারায়ণ শিলার সেবা-পূজার ভার না নিলে আমার রাজ্য ছারখার হবে। আমার বংশে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না।'

রামঠাকুর বললেন, 'আমি এ শিলা নিয়ে কোথাও যাব না। এ শিলা এখানেই থাকবে। প্রয়োজন হলে আপনি এখানেই মন্দির তৈরি করে এঁর সেবাপূজার ভার নিয়ে আমাকে মুক্তি দিন।'

রাত শেষ হতেই লোকেরা জঙ্গলের চারিদিক পরিষ্কার করতে লেগে গেল। দিনরাত লোকজন খেটে একদিন মন্দির তৈরি হল। নারায়ণ শিলা সেই মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত হলেন। রাজার একান্ত অনুরোধে

রামঠাকুর সেখানে বৎসরাধিক কাল থেকে সেবাপূজার কাজ চালিয়েছিলেন। উপরের অসাধারণ ঘটনায় বোঝা গেল ঈশ্বরকৃপা কখন কি ভাবে কোন পথে আসে তা কেউ বলতে পারে না। ইশ্বরকে বোঝা কি এতই সোজা!

বই পড়ে যাঁকে ধরা যায় না, শাস্ত্র ঘেঁটে যাকে মেলে না, তিলক মালাতে যাঁকে বাঁধা যায় না, সেই পরম করুণাময় ঈশ্বরকে জানতে হলে আগে নিজের হৃদয় মন্দিরে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক অন্ধ আর এক অন্ধকে কি পথ দেখাতে পারে?

সাধক তুলসীদাস বলেছিলেন:

"তুলসী জগমে আওকে সবহু মিলিত ধায়।
নাজানে কোন বেশমে নারায়ণ মিল যায়॥"

অর্থাৎ এ দুনিয়ায় এসে সবার সাথে মিলে মিশে একাত্মা হয়ে থাক। কেউ কি বলতে পারে কোন বেশে নারায়ণ কখন এসে দেখা দেবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাগবদ জীবনের কথা লিখতে গেলে পরপব সাজিয়ে লেখা অসম্ভব। এমন ধারা বৈচিত্র্যময় লীলা জীবন আব কোন মহাপুরুষের আছে কিনা আমার জানা নেই। রামঠাকুর নিজেকে সব সময় গুপ্ত ভাবে রাখতে ভালবাসতেন। কখন কি করছেন, কি করবেন তা কারও বোঝার উপায় ছিল না। তাঁর রহস্যময় জীবনের বহস্যভেদ করা আমার মত দিন লেখকের পক্ষে অসাধ্য।

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের কনিষ্ঠ ভাই লক্ষ্মণচন্দ্র ঠাকুরের পরম প্রিয় ছিলেন। তিনি রামঠাকুবের যমজ ভাই। তিনিও চরিত্রবান সরল, প্রেমভক্তিপরায়ণ ও মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগীদার ছিলেন। পরের দুঃখে তার মন অত্যন্ত বিচলিত হত। কারও অসুখ-বিসুখ হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যেতেন ও নিজে অনেক কিছুর ঔষুধ জানতেন বলে

তাই দিয়ে অসুস্থকে সুস্থ করতেন। বিনিময়ে একটা পয়সা কারও কাছ থেকে কোনদিন নেন নি। মানুষের ব্যথা যেন তাঁর নিজ অঙ্গের ব্যথা।

নাম সংকীর্তন যেখানে হত সেখানে তাঁকে দেখা যেত। নামামৃত সুধা পান করে এতই মত্ত হয়ে যেতেন যে তাঁর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হত। কখনও কখনও কীর্তনানন্দে তিনি মাটিতে গড়াগড়ি দিতেন। কীর্তনে তিনি এত বিভোর হয়ে যেতেন যে তাঁর খাওয়া নাওয়া সব বিস্মরণ হয়ে যেত। একবার পাশের গ্রামে একটা পিতলের কলসী নিয়ে দুধ আনতে গেছেন। সেখানে গিয়ে দেখেন কীর্তনের আসর বসেছে। লক্ষ্মণঠাকুর বসে গেলেন আসরে। একদিন, দুদিন, তিনদিনের দিন শূন্য হাতে ফিরে এলেন। দুধ আনার জন্য যে পিতলের কলসীটা নিয়ে গিয়েছিলেন সে কথাও তাঁর আর মনে নেই। এমনি তন্ময়তা, এমনি ভাবাচ্ছন্ন ছিলেন তিনি। এ দুদিন তিনি মুখেও কিছু দেন নি।

এরই নাম তন্ময়তা। এর নামই নামীর নামে বিভোর।

তিনি বিয়ে করেন নি। জীবনের বেশি সময় তাই কেটে গেছে পরোপকার সাধনে। ঝড়-বাদলের রাতেও তাঁকে শ্মশানে যেতে হয়েছে।

তিনি যেদিন দেহত্যাগ করেন রামঠাকুর তখন কাশীতে। সেখানে বসেই তিনি ভক্তদের বললেন 'লক্ষ্মণ আজ চলে গেল।' রামঠাকুর কিছু মাত্র বিচলিত হলেন না। এই ভাব—এ আর নতুন কি! মানুষ জন্মালেই মরবে এর জন্য হাহুতাশ কিসের, শোকতাপ কিসের!

ভগবান শংকরাচার্য বলেছেন :

"যাবশরণং তাবন্মরণং তাবজ্জননী জঠরে শয়নম্।

ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষ কথমিহ মানব সব সন্তোষঃ॥"

আধ্যাত্মিক জগতে রামঠাকুর সদগুরু লাভ করেছেন। তিনি যে একজন মহান সাধক হবেন এতে আর আশ্চর্য কি! যে ভক্তিবীজ তাঁর দেহে মনে শৈশব থেকে অঙ্কুরিত হয়েছিল কালে কালে তাই একদিন

বিরাট মহীরুহে পরিণত হল। সেই মহীরুহ এমন ডালপালা বিস্তার করল যে তার নীচে সব মানুষ আশ্রয় পেল।

নির্ভয় যে হতে পারে তার আবার ভয় কোথায়?

আজ তাই দেশে দেশে দিকে দিকে রামঠাকুরের অগণিত আশ্রিত জনের সংখ্যা কম নয়। দেশের মানুষের ঘরে ঘরে তিনি পদধূলি দিয়েছেন—কত ফলমূল মিষ্টান্ন দিয়ে তাঁর সেবার ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু তিনি কিছুই মুখে দেন নি। স্পর্শ করে প্রসাদ রূপে তা সব বিলি হয়ে গেছে। তিনি সারাদিন রাতে একটা ডুমুর সিদ্ধ করে একটু লবণ দিয়ে খেতেন। শোবারও তাঁর কোন পরিপাটি ছিল না। যেখানে সেখানে একটা মাদুর বিছিয়ে তিনি শুয়ে পড়তেন।

এই যে জীবনযাপন এ নিশ্চয়ই মনুষ্য জীবনযাপন নয়। এ জীবন মহাজীবন। এই মহাজীবনের চন্দ্রাতপতলে যারা আশ্রয় পেয়েছে তারা নিরাশ্রয় কি হতে পারে?

রামঠাকুর তাঁর জননীকে শুধু একমাত্র কষ্ট দিয়েছেন খাওয়া নিয়ে। কতদিন ভাল জিনিস রান্না করে ছেলের সামনে দিয়েছেন মা, আর ছেলে তা স্পর্শ করা দূরের কথা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দিয়েছেন।

কমলাদেবী ছেলেকে চোখের সামনে অভুক্ত দেখতে পারেন নি। দিনের পর দিন একই ঘটনা। বাধ্য হয়ে মধ্যম পুত্রবধূ প্রসন্নকুমারীর উপর তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ভার ছেড়ে দেন।

রামঠাকুর প্রসন্নকুমারীর মুখের উপর কথা বলতে পারতেন না। সংসারে এই মানুষটির কাছে তিনি কেঁচো হয়ে যেতেন।

প্রসন্নকুমারী একদিন পায়সান্ন রান্না করে বলেছেন, 'সোনা ঠাকুরপো কি সুন্দর পায়েস রেঁধেছি, যতটুকু দেব সবটাই কিন্তু খেতে হবে। না খেলে কিন্তু ছাড়ব না।'

রামঠাকুর হেসে জবাব দিয়েছেন, 'হ্যাঁ খাব বই কি!'

বললেন বটে খাবেন কিন্তু সামান্য একটু খেয়ে উঠে পড়লেন। এ দুনিয়ায় তিনি নিজে কিছু খাবার জন্য বোধ হয় আসেন নি। যে খাদ্য

তিনি সংগ্রহ করেছেন তা তিনি বিলিয়ে দিতে চান সবার মাঝে।

সে খাদ্য কি? সে খাদ্য ঈশ্বর ভক্তি, ঈশ্বর প্রেম।

এ জনমে এই খাদ্যেরই পরিবেশক তিনি।

রামঠাকুর কিছু খেলেই জননী কমলাদেবী সুখী। চোখের সামনে ছেলেটা না খেয়ে শুকিয়ে যাবে এ কি কোন মা সহ্য করতে পারে? তাই তিনি বারবার প্রসন্নকুমারীকে বলতেন, 'মা তুমি ওকে দুটো খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখ। একটা ডুমুর সিদ্ধ, একটু গোলমরিচ চিনি দিয়ে খেলে ও কতদিন আর বাঁচবে?'

রামঠাকুর এই আছেন এই নেই। কোথায় যান কে জানে! বাড়ি না থাকলে বা একদিন বাড়ি না আসলে কেউ তাঁর খোঁজ করে না। কেননা সবাই জানে এই রহস্যময় মানুষটিকে। কোথায় তাঁকে খুঁজবেন।

বেশ কিছুদিন থেকে তাঁর কোন সন্ধান নেই। বাড়িতে মধ্যমাগ্রজ জগবন্ধু কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। তাঁর মুখের দিকে চাইলে মনে হয় তিনি বুঝি জীবনের শেষ দিন গুনছেন।

ক্ষীণ কাতর সুরে তিনি মাঝে মাঝে বলেন, 'ওরে তোরা রামকে ডাক না, কোথায় যে সে গেল। বলছিল আমার শেষ সময়ে কাছে থাকবে কিন্তু কই এল না এখনও।'

কখনও গভীর ঘুমে অচেতন আবার নিদ্রা ভাঙলে বলে ওঠেন, 'হ্যাঁগা রাম এল নাকি; তবে কি সে আসবে না? কিন্তু সে যে কথা দিয়েছিল।'

আকাশে মেঘ ঘুরে বেড়ায়। কখনও অল্প অল্প বৃষ্টি হয়, কখনও প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত। রোগীর যেন অস্থিরতা বাড়ে। দু'দিন পর সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারের মধ্যে কে যেন বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়াল। প্রসন্নকুমারী চীৎকার করে উঠলেন, 'সোনা ঠাকুরপো এত দেরী করে এলে?'

অন্তর্যামী রামঠাকুর বললেন, 'কেন বৌদি আমিতো ঠিক সময়েই এসেছি। দাদা কেমন আছে?'

রোগশয্যার কাছে যেতেই জগবন্ধু বলে উঠলেন, 'রাম এলি? তোর জন্যই তো আমি অপেক্ষা করে আছি।'

রামচন্দ্রের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুই এলি আমি বাঁচলাম।'

রামঠাকুর সারারাত রোগীর কাছে বসে থাকলেন। ভোরের দিকে তিনি বললেন, 'নাও এবার দাদাকে তুলসীতলায়। কানে নাম দাও।'

ঠাকুর নিজেই তাঁর কানে নাম দিলেন। একটি জীবনদীপ নিবে গেল। দয়ালরামের আশায় আশায তাঁর প্রাণটা বুঝি বের হচ্ছিল না।

সকাল থেকেই আবার বর্ষণ শুরু হয়ে গেল।

জগবন্ধুকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল।

রামঠাকুরও চললেন শ্মশানে।

একটু পরেই চিতা সাজিয়ে আগুন জ্বেলে দেওয়া হল।

এদিকে শুরু হল প্রচণ্ড বারিপাত। সবাই চিন্তায় আকুল চিতা বুঝি নিবে যায়।

রামঠাকুব চিতার চারপাশ ঘুরে এসে বললেন, 'চিতা নিববে না, এক ফোটা জলও চিতার ধারেকাছে আসবে না।'

সবাই অবাক হয়ে দেখল যে চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে আর প্রচণ্ড বর্ষণ তার চার পাশ দিয়ে হয়ে চলেছে। চিতার আগুনে এক ফোটা জলও পড়ছে না। এসব কথা বলতে গেলে চমক লাগে। লিখতে গেলে কলম কাঁপে।

কিন্তু এর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। অপার্থিবও কিছু নেই।

কেন হবে না, সবই সম্ভব যদি কৃপাময় ভগবানের কৃপাধন্য হওয়া যায়।

ভগবানের পড়শী হলে ঠিক তিনি তাকে দেখেন বইকি!

এমনি ঘটনা দেখিয়েছিলেন সাধক বামাক্ষেপা তার মায়ের শ্রাদ্ধের সময়। যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা খেতে বসেছিলেন—মুশলধারে বৃষ্টি নামল। কিন্তু বামাক্ষেপা তাঁর হাতের ত্রিশূল দিয়ে গণ্ডী এঁকে দেওয়ায়—

ফলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা পরম পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়েছিলেন। এক ফোটা জলও তাঁদের কারও গায় লাগে নি।

সবই হয়।

এখানে বিজ্ঞান বুঝি অজ্ঞান।

যে অদৃশ্যশক্তি এইসব অঘটন ঘটাতে পারে, সেই শক্তির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা সবই পারেন।

রামঠাকুর সেই অদৃশ্যশক্তির তন্ত্রধারক।

তাঁর কাছে অসম্ভব কি আছে!

রামঠাকুর অতি শৈশব থেকেই যোগাভ্যাস করতেন সবার চোখের আড়ালে। একদিন প্রসন্নকুমারী দেখতে পেলেন যে তাঁর সোনা-ঠাকুরপো যোগাসনে বসে ধীরে ধীরে উপরে উঠছেন। হঠাৎ তিনি এই অবস্থা দেখে চীৎকার করে উঠতেই তিনি মাটিতে পড়ে যান।

তিনি প্রসন্নকুমারীকে বলেন, 'যা দেখলে তুমি দেখলে, এ কথা যেন আর কেউ না জানে।'

প্রসন্নকুমারী কিন্তু চেপে রাখতে পারেন নি। তাঁর সোনাঠাকুরপো এমন গুণের অধিকারী, সবাইকে না বললে কি মানায়। ঘটনাটা তিনি রাষ্ট্র করে দিলেন।

তারপর থেকে রামঠাকুর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কোথায় যে গেলেন তা কেউ জানে না।

রামঠাকুর তাঁর জীবনের প্রতিটি দিনেই এমন এক একটা বিস্ময়কর ঘটনার অবতারণা করেছেন যা দেখলে মনে হয় তিনি নিজেই একটা পরম বিস্ময়। তাঁর সঙ্গ করেছেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন এমন মানুষ অনেক ছিলেন কিন্তু কেউ তাঁর কার্যকলাপের কোন কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। কি করে পারবেন?

তিনি না জানালে কি করে জানবেন। তিনি না বোঝালে কি করে বুঝবেন।

কাঁঠালের কোয়া ছাড়িয়ে দেয় একজন, পরিবেশন করে একজন আর যে খায় সে আস্বাদন করে। যে কাঁঠাল আস্বাদন করে সেই বোঝে কাঁঠালটা মিষ্টি না পান্‌সে।

কোয়া যে ভাঙল, বীচি বার করল যে আঙুলের আঁটা ছাড়াতে ব্যস্ত থাকল—ওরা কেউ জানল না কাঁঠাল খেতে কেমন লাগে। যে আস্বাদন করল সেই শুধু জানল।

রামঠাকুরকে তো জানে সবাই। চেনে সবাই, কিন্তু আস্বাদন করতে পারে কজন!

আস্বাদন কি! চর্চা ও চর্যা।

কি সে চর্চা, কি সে চর্যা?

সে চর্চা আত্মচর্চা, সে চর্যা আত্মচর্যা।

এই দুই ছাড়া ঈশ্বর আস্বাদন হয় না।

সংসারে মায়াবদ্ধ জীব আমরা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শুধু পেটের অন্ন যোগাতেই মশগুল। মায়ার আবরণ সরিয়ে মাঝে মাঝে যে একটু অন্য ভুবনে দৃষ্টি দেব তারও কোন উপায় নেই। যাঁরা চতুর তাঁরা সংসারে সংসার করে ফতুর হয়ে গেলেও ঈশ্বরানন্দ লাভ করার জন্য মাঝে মাঝে অন্যমনা হন।

তেমনি ধারা চতুর লোকের অভাব খুবই এ সংসারে।

রামঠাকুর বলেছেন, 'সংসার চিন্তার কারণেই মন নানাদিক ছুটা-ছুটি করে। তবে মন দ্বারা কেউ নাম করে না। নাম হয় প্রাণ দ্বারা। মনকে ছেড়ে দিয়ে নামের আশ্রয় নিয়ে একমনে যত দূর পারা যায় নাম করে যেতে হবে। নামরূপে ভগবান সর্বজীবের হৃদয়ে বিদ্যমান।'

ছোট ছোট ছেলেরা ঘুড়ি ওড়ায়।

লাটাই থাকে হাতে, সুতো ছেড়ে দেয়।

নাম হচ্ছে লাটাই, মন হচ্ছে সুতো।

নামরূপী লাটাই শক্ত করে ধরে মনরূপী সুতো ছেড়ে দিতে হবে।

এক সন্তানসম্ভবা স্ত্রীলোককে দেখতে গিয়ে রামঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁগা তোমার কি খেতে ইচ্ছে হয়।' স্ত্রীলোকটি বলে উঠল, 'বাবা পাকা বেল খাওয়ার বড় ইচ্ছে হয়েছে।'

রামঠাকুব বললেন, 'তাই হবে, তোমার আশা নিশ্চয় পূরণ হবে।'

যাঁরা এই কথা শুনলেন তারা চমকে গেলেন কি সর্বনাশা কথা। এখন কি বেলের সময়, যে পাকা বেল পাওয়া যাবে। গাছ ভর্তি এখন ছোট ছোট বেলের কুশি দেখা দিয়েছে। উনি কি ভাবে তাকে কথা দিলেন।

কেউ বললে, কি জানি উনি জানেন বেল কোথায় পাবেন।

কেউ বা বললেন, উনি তো আমাদের মত মানুষ নন। ওঁর অসাধ্য কি আছে!

রামঠাকুর চলেছেন আওারিয়ার হাটে। উদ্দেশ্য বেলের সন্ধান করা। পথে যেতে যেতে হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা মুসলমান জাতীয় লোক পথের ধারে শুয়ে ছটফট করছে। ঠাকুর তার কাছে যেতেই সে বলে উঠল, 'মলাম গো, আবার সেই শূল বেদনাটা উঠেছে।'

পরম দয়াল ঠাকুর তার কাছে গিয়ে সারা গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন। হাটের পথে কত লোকই তো চলেছে, এ দৃশ্য দেখে কারও মনে কৌতূহল জাগল না। তারা যে যার চলে গেল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, লোক না পোক।

ওরা পোকাই ঠিক। মানুষের প্রতি যে মানুষের কোন দরদ নেই সে তো পোকা ছাড়া আর কিছু নয়।

এই পোকা ভরা সংসারে শান্তি কি ভাবে আসবে।

মানুষ হতে গেলে যে হুঁশ থাকা দরকার তা হাজারে একটা মেলে কিনা সন্দেহ।

চণ্ডীদাস বলেছেন, সবাব উপবে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। এহ বাহ্য আগে কহ আর।

কে শোনে কার কথা। সবাই কর্তা এখানে। কর্তালি করতে করতেই সবার সময় কাটছে।

মুসলমান লোকটি কিছুক্ষণ বাদে উঠে বসল।

রামঠাকুর তার দিকে চেয়ে আছেন।

লোকটি বললে, 'বাবা আমার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, দেহে যেন আর কোন রোগ নেই।'

তারপর লোকটি তাব ধামার ভিতব থেকে একটা পাকা বেল বার করে গড় হয়ে প্রণাম করে বললে, 'বাবা আপনি আমার জীবন বাঁচালেন। আমার এই পাকা বেলটা হাটে নিয়ে যাচ্ছিলাম বেচতে, তা আপনি যদি দয়া কবে বেলটা সেবা করেন আমি বড় সুখ পাব।'

রামঠাকুর বললেন, 'তুমি গরিব মানুষ, যা দাম হয় নাও আমি বেলটা নিচ্ছি।'

'তা কি হয় ঠাকুর, এ বেলের দাম তো আমার মিলে গেছে। আপনি আমার জীবন দান করেছেন। হাজারটা বেল দিলেও সে দেনা শোধ হবে না॥'

রামঠাকুর পাকা বেলটা হাতে নিয়ে সোজা সেই স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়ে বেলটা তার হাতে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরদিন সেই মুসলমান লোকটি খুঁজতে খুঁজতে এসে সেই স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়ে হাজির।

স্ত্রীলোকটি বললে, 'হ্যাঁ বেল বটে, এত সুন্দর মিষ্টি বেল আমি কোন দিন খাই নি বাবা।'

'সবই ঠাকুরের ইচ্ছে। অসময়ে বেল না পাকলে ঠাকুর দর্শন হত না। বড় ভাগ্য আমার।' লোকটি চলে গেল।

ঠাকুরের খোঁজ সে পাবে কি করে? তিনি তখন কোথায় চলে গেছেন কে জানে।

রামঠাকুর তখন হিমালয়ের সমতল ভুমিতে পা দিয়ে দেশের দিকে হাঁটা শুরু করেছেন। তখন দেশের মানুষ রামঠাকুরের ফিরে না আসা দেখে সবাই ভেবে নিলেন তিনি আর কোন দিন দেশে ফিরবেন না। সাধু হয়ে কোথাও চলে গেছেন।

প্রথম থেকেই রামঠাকুরের পরিবারের সবাই এ ধারণা করে নিয়েছিলেন যে তিনি সাধারণ মানুষের মত এ পৃথিবীতে আসেন নি। এ সংসার অরণ্যে আপনজনরূপী ও আত্মীয়স্বজনরূপী জীবজন্তুর মধ্যে তিনি কোন মতেই থাকবেন না। মহৎ জীবনসত্ত্বা নিয়ে যিনি এসেছেন, জীবন পাত্র পূর্ণ করেই যিনি মাটি স্পর্শ করেছেন, জাগতিক সুখ-দুঃখের ভাগীদার তিনি কেন হবেন!

গোড়া থেকেই তাঁর জানা এখানে সবাই অচেনা। এখানে আপন-জন বলতে কেউ নেই। এখানে থাকতে গেলে ষড়রিপুর দাসত্ব করতে হবে! চারদিক ফাঁদ পাতা আছে। একবার যদি ফাঁদে পড়া যায় তাহলে আর মুক্তি নেই। এখানে সবাই শুধু নেবার জন্য বসে আছে। দেবে না কেউ কিছুই।

এমন যে পৃথিবী, এ পৃথিবীর অধিবাসী নাইবা হলাম।

তাই তিনি আপন পথ খুঁজে নিয়েছেন। সে পথ অমৃতের। যে পথে গেলে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। সে আনন্দ সংসারে নেই। সদা-নন্দময় ঈশ্বর, চিদানন্দময়রূপে সে পথে বিরাজ করছেন। হৃদয়ে এই উপলব্ধি নিয়ে হিমালয় থেকে ফিরলেন রামঠাকুর।

আধ্যাত্মিক জীবনের চাবিকাঠি তাঁর ট্যাকে। কিন্তু জনসমক্ষে তাঁর প্রচার নেই। ঘরবাড়িতে যেমন আর দশজন থাকে তিনিও তেমন ভাবে দিন কাটাতে থাকেন। সংসারে অভাব-অনটন আনন্দ-নিরানন্দ

সব কিছুরই তিনি এখন শরিক। আত্মীয় স্বজন লোক-লৌকিকতা, সামাজিকতা সব কিছুই তিনি গৃহী মানুষের মত করে চলেছেন।

সংসারে আর্থিক দুরবস্থা আছে।

এটা নেই সেটা নেই।

পেটের জ্বালার মত জ্বালা বুঝি আর কিছুই নেই। এ জ্বালায় জ্বলছে সবাই। এ দহন জ্বালা যে কি ভীষণ তা যার আছে সেই জানে।

যে দেশে ক্ষুধার অন্ন শৃগাল ও মানুষ ভাগ করে খায় সে দেশে অধ্যাত্মবাদ কি ভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। অধ্যাত্মসাধনা ছাড়া যে কারও মুক্তি নেই সে কথা ভুলিয়ে দিয়েছে পেটের জ্বালা।

তাই মানুষ আজ ভক্তিহীন, প্রেমহীন, শ্রদ্ধাহীন।

ঈশ্বরবিমুখ মন আজ ঘরে ঘরে।

কোথায় সে 'ঈশ্বর ঈশ্বর' ব্যাকুলতা, আকুলতা।

কোথায় সে একাগ্রতা একনিষ্ঠতা।

মহাপ্রভু কতবার কেঁদে কেঁদে বলেছেন •

"প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া করো এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, করো কৃষ্ণ শিক্ষা।"

এ ভিক্ষায় কেউ বের হয় নি।

তুলসীদাস তাঁর জীবনের প্রান্তসীমায় এসে ভক্তজন সমক্ষে দুঃখ করে বলেছিলেন :

"তুলসী ইয়ে সংসার মে কাহাছে ভক্তি ·ভেট
তিনবাতছ লটপট্ হায় দামড়ি চামড়ি পেট।"

অর্থাৎ হে তুলসী, এ সংসারে ভক্তি শ্রদ্ধা কোথায়, অর্থ, চামড়া আর পেট এই তিন জিনিসে মানুষকে প্রতিনিয়ত আছাড় খাওয়াচ্ছে।

রামঠাকুর দেখলেন সংসারে বাস করতে গেলে তো অন্ধ হয়ে থাকা যাবে না। এখানে থাকতে গেলে অর্থ চাই, অর্থ না হলে

সংসারের জ্বালা নিবৃত্তি হবে না। তিনি অর্থ অন্বেষণে নোয়াখালি গেলেন।

কি আশ্চর্য এ অর্থ। যা উপার্জন করবার জন্য অন্যত্র যেতে হয়। অথচ ঘরে বসেই অর্জন করা যায় পরমার্থ। ঘরে বসেই লাভ করা যায় ঈশ্বরের কৃপা।

তাঁর প্রমাণ রামকৃষ্ণ পরমহংস। সাধক রামপ্রসাদ।

ঘরে বসে ঈশ্বর কৃপা লাভ করতে হলে সে ঘর বেশ মজবুত করতে হবে। সে ঘরে বেড়া দিতে হবে অনন্য ভক্তি দিয়ে। ছাদ বানাতে হবে নিখাদ প্রেম দিয়ে। চোখের জলে শ্রদ্ধার মশলা দিয়ে মেঝে তৈরি করতে হবে।

এ ঘর ঝড়ে ভাঙবে না, বৃষ্টিতে ভিজবে না রোদেও পুড়বে না। রামঠাকুর আপাততঃ এই ঘরে চাবি লাগিয়ে অন্যত্র গেলেন।

নোয়াখালি শহরে এক ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের বাড়িতে রান্নার কাজ নিলেন। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস। ভারতবর্ষের এক মহান জ্ঞানতপস্বী অর্থের জন্য পাচকবৃত্তি করতে শুরু করলেন।

ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ মহকুমার বাসুরিয়া গ্রামের আর এক সিদ্ধ সাধক শ্রীশ্রীরাইমোহন দুই আনা রোজে জন খেটেছিলেন সংসারের অভাব মোচনের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ চাকরী করেছিলেন রানী রাসমণির। আনন্দময় ভগবানের সংসারে এ সব ঘটনা যেন এক বিরাট ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়।

রামঠাকুর এমন উপাদেয় রান্না করতেন যে গৃহস্বামী পরম পরিতৃপ্তি সহকারে তা আহার করতেন। এই পাচকের স্বরূপ গৃহস্বামী জানবেন কি করে? বাড়ির কর্তা ও গিন্নী তাঁকে সাধারণ পাচকের মত মনে করে তাঁর সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করতেন। কর্তা খেয়ে অফিসে চলে যান। গিন্নী খেয়ে শুয়ে পড়েন। রামঠাকুর সব শেষে নিজের আহার্য রান্না

ঘরে ঢেকে রেখে স্নান আহ্নিক জপাদি সেরে ধীরে ধীরে সমস্ত খাবার পিছন দরজা দিয়ে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসতেন। নিত্য দুটো শৃগাল এসে সে আহার্য গ্রহণ করত। ঠিক সময় মত শৃগাল দুটো জঙ্গলে এসে বসে থাকত। কোন কোন দিন হয়ত একটু দেরী হয়ে যেত।

রামঠাকুর খাবার নিয়ে গিয়ে মনে মনে বলতেন, 'ইস বড় দেরী হয়ে গেল। তোদের একটু কষ্ট দিলাম।'

কর্তা ও গিন্নী ভাবতেন পাচক নিত্যই আহার্যদ্রব্য গ্রহণ করেন। তাঁর চেহারার এতটুকু পরিবর্তন হয় নি দিনের পর দিন না খাওয়ায়। শরীরে কোন রোগ বালাই নেই। বেশ কর্মঠ বলেই তাঁকে মনে হয়।

কিন্তু সত্য কি চাপা থাকে ?

একদিন গৃহস্বামী নিজে সব কিছু দেখে মরমে মরে গেলেন।

ছিঃ ছিঃ একি অন্যায়, দিনের পর দিন যিনি এই ভাবে অভুক্ত থেকে সকলকে খাদ্য পরিবেশন করছেন তিনি তো সাধারণ মানুষ নন।

কে এই অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন সাধক !

তিনি আর রামঠাকুরকে পাকের কাজ করতে দিলেন না। তাঁর কাছেই তিনি ওভারশিয়ারের কাজে নিযুক্ত করে নিলেন।

এই সময় রামঠাকুর যা রোজগার করতেন তার সামান্য অংশ রেখে বেশির ভাগ বাড়িতে পাঠাতেন।

তাঁর কোন কাজে আলস্য নেই। কোন বিরক্তি নেই। যে কাজ তিনি করতেন তা এত নিষ্ঠার সঙ্গে করতেন যে সবাই অবাক হত।

ফাঁক আর ফাঁকি। মনুষ্য জীবনের দুইই চালাকি।

অচল সিকি আর মেকি মনুষ্যত্ব দুই-ই সমান।

এই গুণে যারা গুণী তারা নিষ্ঠার মর্ম কোনদিনই বুঝতে পারে না।

রামঠাকুর এক চলন্ত জীবন্ত বিগ্রহ।

যে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আছে করুণার রেখা। তাঁর শ্রীমুখ

অভয়বাণীর আধার। বুকে নিবিড় আশ্রয়, দুই হাতে তাঁর স্নেহ প্রেম, দুই চোখে তাঁর বিশ্বাস আর আশ্বাস।

নোয়াখালির কাজ করতে এসে জন্মের মত তাঁর অন্নত্যাগ হল। সে এক করুণ ইতিহাসই বলা যায়।

একদিন রাতে রামঠাকুর আর জনতিনেক লোক শবদাহ করতে শ্মশানে গেলেন। গভীর রাত। অন্ধকারের চাদরে সম্পূর্ণ ঢাকা। কোথাও একটু আলোর রেশ নেই। শবদাহ করার সময় নানা রকম ভয়াল জিনিস তাঁদের চোখে এসে পড়ে। যে কোন মানুষের ভয় পাবারই কথা। এরাও ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন। ঘন অন্ধকারে কাঁপতে কাঁপতে সবাই শ্মশান ছেড়ে এলেন। কিন্তু যে ভয় তাঁদের শরীরে প্রবেশ করল তার ফলে তিনজনই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হলেন। এ জ্বর এমনই মারাত্মক আকার ধারণ করল যে কারও কোন জ্ঞান থাকল না। সর্বদাই বেহুঁশ, শেষে সবাই জ্বরের ঘোরে আবোলতাবোল বকতে লাগলেন। নানান চিকিৎসার পর ঠাকুর বাদে অপর দুজন ধীরে ধীরে সুস্থ হলেন। কিন্তু ঠাকুরের অবস্থা চরমে উঠল। তাঁর জীবনের আশা কমে এল।

এমন অবস্থায় গুরুদেব তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, 'ভাল হয়ে যাবি ঠিক, কিন্তু অন্ন তোকে আর স্পর্শ করতে হবে না। এ জন্মের মত তোর অন্নত্যাগ হল।'

গুরুদেব চলে গেলেন। ঠাকুর ধীরে ধীরে আবার সুস্থ হতে লাগলেন।

নোয়াখালির মাটিতে তাঁর অন্নসেবার চিরসমাপ্তি ঘটল। একে তিনি কিছুই খান না তারপর এই ভাবে তাঁর অন্নত্যাগ হওয়াতে তিনি যেন মনে মনে সুখী হলেন। সারা জীবনে তাঁর কোন জিনিসে এতটুকু লোভ নেই, মোহ নেই। অন্নত্যাগ তাঁর কাছে কিছুই না। সারাদিনে একটা যজ্ঞডুমুর বা একটু চিনির দলা খেয়ে যাঁর দিন কাটে তাঁর কাছে এটা কোন ঘটনাই নয়।

অমৃতের আস্বাদ যিনি পেয়েছেন এ জাগতিক আহারে তাঁর আর কি প্রয়োজন আছে।

রামঠাকুরের দীক্ষা দেবার রীতি ছিল ভিন্ন রকমের, তিনি সঙ্গোপনে কারও কর্ণকুহরে কোনদিন মন্ত্র দেন নি। তিনি বহু লোকের মাঝে উচ্চৈঃস্বরে নাম দিতেন।

বর্তমানে দীক্ষা দেবার যে সব অনুষ্ঠান দেখা যায় তাতে বহু কিছু উপকরণাদি সংগ্রহ করে দীক্ষাদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু রামঠাকুর কোনদিন অনুষ্ঠান করে দীক্ষা দেন নি বা কারও কাছ থেকে কিছু নেনও নি।

তিনি বলতেন, 'অনুষ্ঠান মানে তো অণুতে স্থান। দীক্ষিত ব্যক্তির প্রতি অণু-পরমাণুতে নাম প্রবিষ্ট হওয়া দরকার। উপকরণাদির কোনই প্রয়োজন নেই।'

যাঁরা কানে মন্ত্র দেন, তাঁদের কথায় তিনি বারবার বলেছেন, 'কানে তাঁরা মন্ত্র দেন কিন্তু নাম পায় প্রাণে, আর প্রাণই নাম করে।'

এই তো দীক্ষা। ভগবানের নামেই তো দীক্ষা মন্ত্র তা আবার গোপনে হবে কেন! উচ্চৈঃস্বরে নামের মধ্যেই তো নামীর স্থান। যে কোন নামকীর্তন চীৎকার সহকারে করাই শ্রেয়।

'কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।'

এর নামই তো নাম। মনে মনে যাঁরা নাম করে তাঁরা নিজের জন্যই নাম করে, তাঁরা স্বার্থপর। নাম ছড়াতে হবে, বিলোতে হবে।

একবার রামঠাকুরের দুই ভক্ত কলকাতায় শ্যামবাজারে একটা বাড়িতে বসে ঠাকুর সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। কথার পর কথা বলে

চলেছেন দুজনে। ঠাকুরের জীবনের এত অজস্র ঘটনা ছড়িয়ে আছে চারিদিকে, যা আলোচনা করতে বসলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যেতে পারে। সব ঘটনা বোধ হয় সবাই জানেও না।

আলোচনা কালে একজন হঠাৎ বললে, 'নাম নিতে হবে রামঠাকুরের কাছে, মন যখন উচাটন হয়েছে তখন এ সুযোগ হেলায় হারালে চলবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে তারা উঠে পড়লেন। পথে এসে একটা খালি রিক্‌শায় তারা চেপে বসলেন, একটু তাড়াতাড়ি চল বাবা জরুরী কাজ আছে।

রামঠাকুর তখন হরচন্দ্র মল্লিকের এক বাড়িতে অবস্থান করছেন। কিন্তু কত নম্বর, ঠিক বাড়িটাই বা কোথায় তা দুজনের কেউ জানে না, দুজনেই একমনে ঠাকুরের কথা ভাবতে ভাবতে চলেছেন। নামপাগল ভক্তটি ভাবছেন ঠাকুর নাম দেবেন তো? কে জানে তিনি এখন কি ভাবে আছেন। অনেকক্ষণ বাদে রিক্‌শাটা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। রিক্‌শাওয়ালা যথারীতি ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

তারা বাড়িতে ঢুকতে যাবেন, হঠাৎ ভাবলেন কে জানে এই বাড়িই তো! এক পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, যান ঠিক জায়গায় এসেছেন। ঠাকুর উপরে আছেন।

দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলেন।

একজন বললেন, আচ্ছা রিক্‌শাওয়ালাকে তো কোন সময়ই বলা হয় নি কোন রাস্তায় কত নম্বর বাড়িতে যাব, তবে ও কি ভাবে ঠিক জায়গায় নিয়ে এসে নামিয়ে দিল!

দুজনে সোজা রামঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, 'ঠিক ঠিক এসে তাহলে পৌঁছেছেন: এখন বলুন কি চাই?'

একজন সাথে সাথে জবাব দিলেন 'নাম চাই।'

রামঠাকুর একটু হেসে বললেন, 'এর নামই ভাব। এই ভাব যার হয় সে সব পায়। নাম নেবার জন্য এই যে আকুলতা, এই আকুলতাই

আপনার কার্যসিদ্ধির সহায় হয়েছে—এই আকুলতা না থাকলে ঘুরে মরতেন।'

কিছু পরই ঠাকুর নামামৃত সুধা পান করালেন।

ভদ্রলোক ঠাকুরকে ভক্তি ভাবে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

পথে বেরিয়ে তারা দুজনই শুধু চিন্তা করতে লাগলেন।

এ কি রকম হল, রিক্‌শাকে তো কোন সঠিক ঠিকানা বলা হয় নি, অথচ সে কি ভাবে ঠিক জায়গায় নিয়ে এল, রিক্‌শাচালক কে? কি ভাবে এমন কাজ সম্ভব হল তা কেউ বুঝতে পারল না।

মন আর মুখ। মুখ আব মন।

এক না হলে ঈশ্বর কৃপা মেলে না।

ছেলে বাড়ি ফেরে নি, রাত কত হল, ঘরে মা আকুলিবিকুলি করছেন, একবার উঠছেন, একবার বসছেন, একবার জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাচ্ছেন।

ছেলে যেই বাড়ি এল মার সবকিছু পাওয়া হয়ে গেল।

ঈশ্বরকে পেতে হলে এমনি আকুলতা আর ব্যাকুলতা চাই।

একবার শ্রীশ্রী ঠাকুর চাঁদপুরে তাঁব আশ্রিত শ্রীঅমূল্য ঘোষের বাড়িতে জন ত্রিশ চল্লিশ ভক্ত নিয়ে বসে আছেন। অমূল্যবাবু বেশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। তিনি সকলের আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থাদি করছেন। এমন সময় অমূল্যবাবুর কুলগুরু এসে উপস্থিত হলেন। অমূল্যবাবু ঠাকুরকে কক্ষান্তরে নিয়ে গেলেন। কুলগুরু ভক্তদের মাঝে বসে আক্ষেপ করতে লাগলেন। আজকাল আর কুলগুরুর কেউ খোঁজ খবর নেয় না। সারা বছর পুজো বা অন্য সময় একখানা কাপড় আর কিছু চাল ডাল পাঠিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করে। আগে দুই শিষ্য বাড়ি থেকে যা পাওয়া যেত তাতেই আমার সারা বছর চলে যেত। আর আজকাল দিনই চলে না এমন হয়েছে দেশের দশের পরিস্থিতি। কুলগুরুর ওপরে সেই ভক্তি শ্রদ্ধা আজ আর নেই।

কুলগুরু এসব কথা বলতে বলতে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন।

চোখের জল তাঁর যেন আর থামে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এ সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অমূল্যবাবুর কুলগুরুকে প্রণাম করে বললেন, 'আপনি অমূল্যবাবুকে ক্ষমা করুন। যত দোষ কিন্তু আমার—এবার থেকে আপনার পাওনা গণ্ডা ঠিক পাবেন।'

ঠাকুরকে প্রণাম করতে দেখে সবাই কুলগুরুকে প্রণাম করলেন।

ময়নামতী শার্ভে স্কুলের অধ্যাপক রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরের আশ্রিত। তিনি শুধু অধ্যক্ষ নন একজন খ্যাতিমান ইঞ্জিনীয়ারও। একখানা নতুন মোটরগাড়ি কিনে ইচ্ছে করলেন ঠাকুরকে গাড়িতে উঠিয়ে তিনি প্রথম ওটাকে পথে বার করবেন। ঠাকুরকে নিয়ে তিনি গাড়ি চালালেন তীব্রগতিতে। বেশ সুন্দর গাড়ি, বেশ দ্রুত চলছে, বিশেষ কোন শব্দ নেই। কিন্তু গাড়ি দ্রুতগতিতে চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থেমে গেল। রাজেনবাবু প্রমাদ গুনলেন, নতুন গাড়ি হঠাৎ কেন থেমে গেল! এমন তো হওয়া উচিত নয়। তিনি অনেক ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না।

হঠাৎ ঠাকুর বলে উঠলেন, এতক্ষণ দেখলেন কিছুই কি বোঝা গেল না। আচ্ছা দেখেন তো পিস্টনের মত কি একটা আছে তাতে কোন গোলমাল হল কি না।

ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনে রাজেনবাবু পিস্টন রড্‌টি টেনে দেখলেন সেটা জ্যাম হবার দরুণ এই বিপর্যয়। অথচ তিনি সবকিছু দেখছেন শুধু এইটা বাদ দিয়ে।

গাড়ি ঠিক হয়ে আবার দ্রুতগতিতে চলতে শুরু কল। ঠাকুর সাথে থাকলে কোন বিপদ যে হতে পারে না এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।.

নোয়াখালিতে থাকাকালীন তিনি প্রতিদিন গভীর রাতে কিছু দূরে এক বনে গিয়ে সাধন-ভজন করতেন। সেই বনে এমন ভাবে তিনি

সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন যে কোন কিছু তাঁর খেয়াল থাকত না। হয়ত বিষধর সাপই তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল, তিনি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এমন আশ্রয়ই তিনি পেয়েছেন যেন তাঁর কাছে ভয়ঙ্কর কিছুই নেই। বিপদআপদও তাঁর কাছে ঘেঁষে না।

একদিন কয়েকজন লোক রামঠাকুরকে বললেন তারাও তাঁর সাথে বনে যাবেন। তিনি বার বার নিষেধ করলেন। কিন্তু তারা তা না শুনে গোপনে ঠাকুরকে অনুসরণ করে পিছু পিছু চলতে লাগলেন। ঠাকুর যে জায়গাটায় সাধনা করতেন সেখানে যেতে গেলে একটা সাঁকো পার হতে হয়। ঠাকুর পার হয়ে গেছেন কিন্তু লোক কটি তখন সাঁকোতে সবে উঠেছে, কেউবা মাঝ সাঁকোতে পৌঁছেছে, এমন সময় চারিদিক থেকে ছোট ছোট ঢিল পাটকেলের বর্ষণ হতে লাগল তাঁদের সর্বশরীরে। তারা সব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পিছু হটতে শুরু করল।

একজন চীৎকার করে বলল, ঠাকুর আমাদের ক্ষমা করুন, বড় অন্যায় হয়েছে।

ঢিল পড়া বন্ধ হয়ে গেল। তারা নিরাপদে সাঁকো থেকে নেমে এসে যে যার ঘরে ফিরল।

ঠাকুর পরদিন তাদের বললেন, 'এ রকম করা ঠিক হয় নি, এ ধরনের কাজে কিন্তু বিপদ আছে।'

ঠাকুর যেন এক জাদুকর। যা দেখাবেন সবাই তাই দেখবে। যা বোঝাবেন তাই সবাই বুঝবে। সাধু, সন্ত, গুরু সবাইকে যাচাই করা একশোবার উচিত। কিন্তু যে যাচাই করবে তারও বোঝবার মত কিছু বোধ থাকা দরকার। সাধু বিচার, গুরু বিচার কি সবাই করতে পারে। যাঁরা তাদের যাচাই করেন তাঁরা নিজেরাই বেঠিক নদীর তীরে বাস করেন।

এ জগতে যত কিছু শক্ত কাজ আছে তার মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করাই হচ্ছে সব চেয়ে শক্ত। ঈশ্বর আছেন এই যে বিশ্বাস, সব সময়ে সব মানুষের থাকে না। সবাই বলে, যা দেখি নি তা বিশ্বাস করি কি করে?

যেহেতু ঈশ্বর নামক বস্তুটির সঙ্গে সাধারণের কোন সম্বন্ধ নেই সেই জন্য তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু একটা বলে পার পাওয়া যায়।

কিন্তু ভগবান ছাড়া এ চরাচরে যে আপনজন কেউ নেই এ মর্ম যে জানে তার আর অবিশ্বাস আসে না। ঈশ্বরকে যে আত্মসমর্পণ করতে পারে ঈশ্বরও তার কাছে স্বীয় রূপ প্রকাশ করেন। প্রহ্লাদ ধ্রুব এঁরা সবাই আত্মসমর্পণ করেছিলেন তাই তাঁদের সামনে তিনি প্রকট হয়েছিলেন।

এই বিশ্বাস সম্বন্ধে বহুল প্রচলিত একটি গল্প আছে। এক বিধবার একমাত্র বালক পুত্র স্কুলে যেতে ভয় পেত বনের মধ্য দিয়ে।

মা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ভয় কি বাবা, তোমার মধুসূধন দাদা তোমাকে সব সময় রক্ষা করবেন।

বালক অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল, কেমন দেখতে মা মধুসূধন দাদাকে ?

তাঁর মাথায় চূড়া, হাতে বাঁশি, পরনে নীলাম্বরী, পায়ে নূপুর। খুব সুন্দর দেখতে।

বালক বললে, ঠিক আছে মা, আমি ভয় পেলে মধুসূধন দাদাকে ডাকব।

ভয় পেলে তাকে আকুল সুরে ডেকে দেখিস, ঠিক তিনি আসবেন। তাঁর যে এই কাজ বাবা, তিনি যে পতিতের ভগবান, বিপদেআপদে সবাইকে তিনি রক্ষা করেন।

বালক নিয়মিত বনপথ দিয়ে স্কুলে যায়। সব সময় ভাবে আমার আবার ভয় কিসের, মধুসূধন দাদা আছেন তাঁকে ডাকব।

একদিন স্কুল থেকে ফিরতে একটু দেরী হয়ে গেল।

বনের মধ্যে ঢুকতেই কেমন যেন আবছা অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেল। বালক আজ সত্যই ভীত হল।

তার গা ছমছম করছে, দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

সে আকুল স্বরে ডাকতে লাগল, মধুসূধন দাদা, আমার যে বড় ভয় করছে। কই তুমি এস, আমি যে বাড়ি যেতে পারছি না।

কাউকে আসতে না দেখে বালক আরও জোরে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল, মা যে বললে তোমাকে ডাকলে তুমি আস, আমি যে এত ডাকছি, কই তুমি তো আসছ না। বালক বার বার একই কথা বলছে আর কাঁদছে। এমন সময় তার চেয়ে সামান্য কিছু বড় একজন বালক সামনে এসে বললে, ভয় কি এইত আমি এসেছি।

তুমি বুঝি আমার মধুসূধন দাদা ?

হ্যাঁ ভাই, এবার চিনলে তো, যখনই ভয় করবে আমাকে ডাকবে। বালক তাঁর দিকে চেয়ে বললে, মা যে বলেছিলেন তোমাব মাথায় চূড়া হাতে বাঁশি, পায়ে নূপুর।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন তোমার মা ! তোমার আকুল ডাক আমাকে এতই চঞ্চল করল যে আমি আর ওসব পরবার সময় পাই নি। তাড়াতাড়ি ছুটে আসতে হয়েছে, চল তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

বালকবেশী মধুসূধন দাদা চলেছেন আগে আগে।

বালক চলেছে পিছু পিছু। বাড়ির কাছে এসে মধুসূধন দাদা বললেন, যাও ভাই, এবার আমি যাই।

আমাদের বাড়ি যাবে না ?

আজ নয়, তোমার মা যেমন ভাবছেন তোমার জন্য, আমার মাও তেমনি আমার জন্য ভাবছেন।

তোমার এখন ভয় করবে না অন্ধকারে একা একা যাবে কি করে ? মধুসূধন দাদা একটু হেসে বললেন, আমি একা একাই এই ত্রিভুবনে ঘুরে বেড়াই, তোমার মত আকুল হয়ে যে ডাকে তার কাছেই আমি ছুটে যাই, আমার কি ভয় করলে চলে।

মধুসূধন দাদা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বাড়ির দরজায় বালকের মা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ছেলের জন্য।

তাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে কোলে নিয়ে বললেন, 'কার সাথে এলি বাবা, আমি যে ভয়ে সারা।'

'কেন মা, মধুসূধন দাদা আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন, কি সুন্দর দেখতে। মধুসূধন দাদা বললেন, যখনই ডাকব তখনই আসবেন।'

'বলিস কি রে!'

মা কিন্তু সবই বুঝতে পারলেন যে পরমদয়াল ভগবান মধুসূধন দাদার বেশ ধরে তাঁর পুত্রকে এগিয়ে দিয়ে গেছেন।

এর নামই আত্মসমর্পণ! একেই বলে অকপট বিশ্বাস!

বিশ্বাস যে করে, তাকে তিনি আশ্বস্ত করেন।

ঠাকুর বললেন ভক্ত জনসমক্ষে, 'ভগবানের নামরূপ সতত চিন্তা করলে দেহ মন বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়ে ভক্তি প্রকট হয়। বিশুদ্ধ ভক্তি লাভ হলেই প্রেম লাভ হয়। সেই প্রেমেই কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে মিলন ঘটে।'

বালক পড়ুয়ার সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের মিলন ঘটেছিল এই বিশুদ্ধ বিশ্বাসেরই ফলে।

ঠাকুর রামচন্দ্রদেব দেশে কিছুদিন থেকে আবার নোয়াখালি চলে গেলেন। শান্তিপুরের অবিনাশ ময়রার সেখানে একটি মিষ্টির দোকান ছিল। বৌ ছেলে-মেয়ে নিয়ে তিনি সেখানেই বাস করতেন। রামঠাকুরের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। তিনি ও তাঁর স্ত্রী ঠাকুরকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন। নোয়াখালিতে ঠাকুর এলেই ছুটে যেতেন। অবিনাশচন্দ্রের দোকানদারীর কথা সব বিস্মরণ হয়ে যেত। কতদিন কতবার তিনি বাড়ি আসেন নি, অবিরাম ঠাকুরের কাছেই পড়ে থাকতেন।

যতক্ষণ কলসী জলে পরিপূর্ণ না হয় ততক্ষণ গাপ্‌গুপ্‌ শব্দ হয়, যেই পূর্ণ হয়ে গেল আর সাড়াশব্দ নেই।

অবিনাশচন্দ্রের হৃদয় পাত্র ভক্তি বারিতে পরিপূর্ণ, তাই তার আর কোন সাড়াশব্দ থাকত না। অর্থাৎ কোন ব্যস্ততা নেই সংসারের জন্য, দোকানের জন্য। রামঠাকুরের সান্নিধ্যে থেকে তিনি ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হয়েছেন।

গুরুকৃপা আর ঈশ্বরকৃপা একই।

টাকার এ পিঠ আর ও পিঠ।

গুরুকৃপা যার লাভ হয়েছে তার ঈশ্বরকৃপাও লাভ হয়েছে।

এ সত্য চির সত্য, শাশ্বত।

অবিনাশচন্দ্র ঠাকুরের অনেক কিছুর প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

তিনি একদিন কথায় কথায় ঠাকুর প্রসঙ্গে বললেন, একরাতে তিনি ও তার স্ত্রী ঘরে নিদ্রিত আছেন। এমন সময় তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে চোর তার সব কিছু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় ঠাকুব রামচন্দ্র যেন বললেন, অবিনাশ এখনও তুমি ঘুমিয়ে আছ, চোরে যে তোমার যথাসর্বস্ব নিয়ে গেল। অবিনাশচন্দ্র নিদ্রাভঙ্গে দেখতে পেলেন যে চোর ক্যাশ বাক্স নিয়ে প্রায় চলে যাচ্ছে। তখনই তিনি চোর চোর বলে চীৎকার করায় চোর সব ফেলে রেখে চলে গেল। চোর কোন জিনিসই নিতে পারে নি।

এই যে ঠাকুরের অদৃশ্য কৃপা, এমন কৃপা কি সবাই পায়!

পায় না—দেহ-মন-প্রাণ আঠার মত তাঁর চরণে লাগিয়ে না দিলে কি এমন কৃপা মেলে।

ঘরের দরজায় তালাচাবি তো সবাই দেয়। কিন্তু চোর ডাকাতে সেই তালচাবি ভেঙে সব চুরি করে নিয়ে যায়। ভক্তির ঘরেও তেমনি ভাবে বিশ্বাসের চাবি লাগাতে হবে।

কেউ এ তালাচাবি ভাঙতে পারবে না।

এ তালাচাবি তো দোকানে মিলবে না।

মিলবে গুরুরূপী ভগবান শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের কাছে।

স্রোতস্বিনী নদীতেও চরা পড়ে কিন্তু ভক্তির নদীতে কোনদিন চরা পড়ে নি। পড়বেও না।

অবিনাশচন্দ্রই আবার ঠাকুর সম্বন্ধে বলেছেন, রামঠাকুর তার বাড়ির পাশেই এক বাড়িতে কালী পুজো করতে গিয়েছিলেন। রাত্রি এক প্রহরে তিনি পুজোয় বসলেন। সে রাত গেল। পরের দিন কেটে গিয়ে রাত্রি এল। শেষ রাত্রে তাঁর ধ্যানস্থ ভাব কেটে গেল। তাঁর পুজো শেষ হল।

এই দীর্ঘ সময় তিনি একাসনে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন।

পূজার্চনায় দেবতা জাগ্রত না হলে পূজা নিষ্ফল।

দেবীকে জাগ্রত করে পূজা করেছিলেন মেহারের বাকসিদ্ধ সাধক সর্বানন্দ।

দেবীর পূজা দেখে গৃহস্বামীর মনে অবিশ্বাস দানা বাঁধল। তিনি ভাবলেন, এ পূজায় দেবী জাগ্রত হন নি, ঠাকুর সর্বানন্দ এ কেমন পূজা করছেন। কেউ বা মন্তব্য করলেন, যাকে তাকে দিয়ে পূজা করালে এমনিই হয়।

পুরোহিত ঠাকুর সর্বানন্দ শুনলেন সে কথা।

সমস্ত শরীর তাঁর ক্ষোভে দুঃখে রাঙা হয়ে উঠল।

তিনি চীৎকার করে উঠলেন, কি আমার পুজোয় দেবী জাগ্রত হন নি, আসুন সবাই দেখে যান, দেবী জাগ্রত কি না।

এই বলে তিনি তামার কুশি দিয়ে মায়ের উরুতে এমন আঘাত করলেন যে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল।

রক্তে ভেসে গেল পূজাঙ্গন।

সবাই সর্বানন্দের পায়ে আছড়ে পড়লেন। ঠাকুর ক্ষমা করুন, এ রক্তপাত বন্ধ করুন।

আবার শুরু হল পুজা। রক্তপাত বন্ধ হল। এর নামই তো পুজা।

একবার দেখা গেল ঠাকুর অনবরত সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে চলেছেন। ভক্তরা অবাক হয়ে গেল ঠাকুর তো এভাবে কোনদিন সিগারেট খান না। তবে আজ কেন তাঁর এই ব্যতিক্রম। ভক্তরা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এর মানে কি —আমরা তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

ঠাকুর বললেন, 'বুঝলেন না, দাঁত ফুললে দাঁতের গোড়া ব্যথা হলে সিগারেটের ধোঁয়া একটা মহৌষধ। টান দিয়ে ধোঁয়া যদি মুখের মধ্যে রাখা হয় দাঁতের যে কোন ব্যথা উপশম হবে।'

ভক্তরা বুঝলেন ঠাকুরের সিগারেট খাওয়ার তাৎপর্য। পরদিন সকালে আবার ঠাকুর সিগারেট ধরিয়েছেন। এমন সময় একজন গৈরিক বসন পরিহিত লোককে দেখে ধোঁয়াটা অন্যদিকে ছেড়ে সিগারেটটা লুকিয়ে ফেলে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। শুধু প্রণাম করেই ক্ষান্ত হলেন না। ভক্তদেরও বললেন কিছু কিছু প্রণামী দিতে, প্রণামী গ্রহণের পালা শেষ হলে সাধুটি গেলেন।

দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলে সবাই বললেন, উনি বোধ হয় মস্ত সাধু, তা না হলে ঠাকুর ঐ ভাবে সিগারেটটা লুকিয়ে ফেললেন কেন? ঠাকুর বললেন, 'আমি ওঁকে চিনি না, কোনদিন দেখিও নি।'

ভক্তরা বললেন, 'বেশ তো তাহলে এত সম্মান দেখালেন কেন?'

ঠাকুর জবাব দিলেন, 'সাধু সন্ত ও গৈরিক বসন পরিহিত কাউকে দেখলে অতি অবশ্যই সম্মান দেখাতে হয়। নাই বা চিনলাম তাঁকে। তাঁর বেশভূষায়ও তো বোঝা যায় যে তিনি সাধারণ মানুষের মত নন। কাউকে সম্মান দেখালে মাথা কাটা যায় না—মাথা নোয়াতে পারে এমন লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে কিন্তু খুব বেশি নয়।

সব কিছু উপাস্য দেবতাকে নিবেদন করে গ্রহণ করা যায়। তা

সে মাছ-মাংসই হোক, বা ডাল তরকারি, মণ্ডা মিঠাই হোক। নিবেদন করে গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই।

একদিন ঠাকুর একজনকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষিত ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'আমাদের শাক্ত বংশ অথচ আমাকে দিলেন বৈষ্ণব মন্ত্র। এ জন্মের মত মাছ-মাংস খাওয়া আমার বন্ধ হয়ে গেল।'

ঠাকুর বললেন, 'নিরামিষ বলতে কি বোঝেন?'

'কেন ডাল তরকারি শাকসব্জী!'

ঠাকুর আবার বললেন, 'জগদীশ বসু বলে গেছেন গাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। তারাও হাসে কাঁদে, সুখদুঃখ তাদেরও আছে তবে তো যাবা নিরামিষাশী তাদের জল আর হাওয়া ছাড়া কিছুই সেব্য নয়।'

একটু থেমে ঠাকুর বলেন. 'যা প্রাণ চায় তাই খাবেন তবে আপনার দেবতাকে নিবেদন করে।'

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের প্রতিটি পদক্ষেপ অলৌকিক মহিমায় মহিমা-মণ্ডিত। তিনি সর্বদ্রষ্টা ঋষি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি সবই দেখছেন, সবই জানছেন। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই তাঁর নখদর্পণে।

একদিন তিনি শিব মন্দিরে গেছেন।

ওখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাড়িতে এসে বললেন, 'মনে হচ্ছে বাড়িতে একটা বিপদ ঘটবে।'

ব্যাস আর কোন কথা নয়।

একেবারে নীরব নিথর হয়ে ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন।

সেইদিন রাত্রেই ঠাকুরেরই এক আত্মীয় হরমোহন ভট্টাচার্যের আট বছরেব মেয়েটার ভয়ানক জ্বর হল। এমন জ্বর যে ধান দিলে খই ফুটে যায়। বাড়ির মানুষ ছুটোছুটি করতে লাগল। ওষুধ গাছগাছড়া কোন কিছুতেই কিছু হল না। পরদিন সকালে মেয়েটা যেন বিবর্ণ হয়ে গেল।

ঠাকুর মেয়েটার রোগশয্যায় বসে একবার চেয়ে দেখলেন মেয়েটার দিকে। কি এক দুর্বিসহ বেদনায় মনে হচ্ছে তার সারা অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে।

ঠাকুর কি ভেবে বললেন, 'ওবে ওকে কারা যেন নিতে এসেছে।' তিনি শুধু এইটুকু বলে বিছানা থেকে নামতেই তার জীবনদীপ নিবে গেল।

ঠাকুর বুঝি সবার জীবনের ঠিকানা জানতেন।

কার কতদিন স্থিতি, কে কবে চলে যাবে, তিনি যেন দিব্য চোখে দেখতে পেতেন।

রামঠাকুরের কথা কখন কি ভাবে মনের মাঝে এসে সাড়া তোলে তা কেউ বলতে পারে না। তাঁর দিব্য জীবনের স্রোত কখন উজান বয় তাও বোঝা শক্ত। আবার ভাটির টান কখন আসে তাও অবোধ্য।

ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন তিনি।

হঠাৎ বলে উঠলেন, 'শান্তি শান্তি বললেই কি শান্তি পাওয়া যাবে? যাবে না। এত আর মুড়িমুড়কি নয় যে পয়সা দিয়ে অবিনাশ ময়রার দোকান থেকে কিনে আনা যায়। আগে শান্ত হতে হবে। শান্ত না হলে শান্তি পাওয়া যায় না। শোন নি, সেই যে—'ধীর সমীরে যমুনার তীবে সতত বসতি বনমালী।' শ্বাস প্রশ্বাস ধীর হলেই ঈশ্বর দর্শন হয়।

একজন বললেন, 'ঠাকুর নাম দিয়েছেন, জপ কবি কিন্তু কেন যেন আনন্দ পাই না।'

ঠাকুর জবাব দিলেন, 'ভাল না লাগলেও নাম করে যাবেন। কুকুরে শুকনো হাড় চিবোয়। হাড় চিবোতে গিয়ে তার মুখ কেটে যায়। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তার মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে তবুও সে ছাড়ে না, চিবোতে থাকে। কিন্তু মড় মড় করে যখন হাড়ে ভাঙন ধরে তখন পরমানন্দে সে রস আস্বাদন করে। মুখ চিরে রক্ত বের হচ্ছে ভেবে যদি সে হাড়টা ফেলে দিত তাহলে তো আর রসাস্বাদন হত না। তেমনি নামের ভিতর

লুকানো আছে অক্ষয় সুধা, কষ্ট করে তার আস্বাদ গ্রহণ করতে হয়।

গ্রামের লোক তাই বুঝি বলে—কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না।

কিন্তু দুঃখ হয় এই ভেবে যে কেষ্ট পাওয়ার জন্য তো কোনদিন কষ্ট করি নি। জীবনে যেটুকু দুঃখকষ্ট পেয়েছি তা সংসার প্রতিপালনের জন্য, যে কষ্ট পেয়েছি তা কন্যার বিয়ে দিতে পারছি না বলে, যে কষ্ট পেয়েছি তা দৈহিক অসুখবিসুখের জন্য।

কিন্তু কৃষ্ণ পাওয়ার জন্য তো এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে নি। যাঁর জন্য কাঁদলে আর কোন ভাবনা থাকে না, যাঁর জন্য ভাবলে সব ভাবনার শেষ হয়। হেলায়ফেলায় সারাদিন যে কেটে গেল—জীবনের সন্ধ্যা তো ঘনিয়ে এল। পারের মাঝি নৌকা নিয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু পারই বা হব কি করে। পারের কড়ি তো সঞ্চয় করি নি। তবে আমার কি হবে।

এ জীবন কি বৃথা চলে যাবে!

এ কথা যখনই মনে উঁকি দেয় তখনই মনে হয় ভিতরে বসে কে যেন বলে ওঠে: ওরে কৃষ্ণ মিলবে, এখনও সময় আছে। জগাই-মাধাই সারা জীবন পাপের পঙ্কিল আবর্তে ডুবে থেকে শেষে মহাপ্রভুর বুকে আশ্রয় পেল। তাদের যত পাপ সব ধুয়েমুছে গেল। রত্নাকর দস্যু পরে বাল্মীকি হলেন।

নাম করতে হবে। ডাকতে হবে পাগলের মত। কাঁদতে হবে। তিনি নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবেন।

সেই আশাতেই জীবন সায়াহ্নে তাঁর নাম করেই সলতে পাকাচ্ছি। যদি কোনদিন তিনি কৃপা করেন তাহলে প্রদীপ জ্বালব।

শ্রীশ্রী রামঠাকুরের কাছ থেকে সবাই সব সময় কিছু কিছু কথা বার

করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঠাকুর সব সময় আড়ালে থাকতে ভাল-বাসতেন বলে সব কথা জানা সম্ভব হত না। মানুষের দুঃখে তিনি কাতর হতেন। মানুষের দুঃখ দূর করাই ছিল তাঁর সাধনা। যার জন্য তিনি জপধ্যান বাদ দিয়ে মানুষের মাঝে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ভক্তবৃন্দের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা সবাই ধরে রাখতে সক্ষম হন নি। কিছু কিছু যা সম্ভব হয়েছে তা এই রকম।

প্রশ্ন : সাধন ভজনে ব্রহ্মচর্য অপরিহার্য কিন্তু ঘোর সংসারী যারা তাদের কি হবে ?

উত্তর : আপনাদের মতে একটা খাসীও ব্রহ্মচারী। ওর নাম ব্রহ্মচর্য নয়। চাঞ্চল্যকর প্রবৃত্তি নিরোধই ব্রহ্মচর্য। একমাত্র নামকে আশ্রয় করে থাকলেই তা সম্ভব।

প্রশ্ন : ধৈর্যই বড় ধর্ম ! কিন্তু যা অসাধ্য তা আমরা যারা গৃহী তারা কি ভাবে পালন করব ?

উত্তর : আপনাদের ধারণা ঐ যে বটগাছটি ওটা খুব ধৈর্যশীল কিন্তু সত্যিই কি তাই ? চিত্ত স্থির হলেই ধৈর্যধারণ হয়। নামের ওপর নির্ভরশীল হলেই ধৈর্যশীল হওয়া যায়।

প্রশ্ন : সত্যাশ্রয়ী কাকে বলে ?

উত্তর : অনিত্য বস্তুতে লিপ্ত না থেকে নিত্য বস্তুতে যার মন বসে সেই সত্যাশ্রয়ী। যা চিরকাল থাকবে তাঁর আশ্রয়ে থাকাই সত্যাশ্রয়ী।

প্রশ্ন : বিদ্যা কি ?

উত্তর : ঈশ্বরে বিশ্বাসই বিদ্যা।

প্রশ্ন : সুখ আর দুঃখ কি ?

উত্তর : সুখ আর দুঃখের অবসানই সুখ। কামের বশবর্তী যে সেই দুঃখী।

প্রশ্ন : কে নীচ আর কে দরিদ্র ?

উত্তর : গুণীই ধনী, অসন্তোষ দরিদ্র।

প্রশ্ন : কে পণ্ডিত ? কে মূর্খ ?

উত্তর : ঈশ্বর জ্ঞান যার আছে সেই পণ্ডিত, ঈশ্বর বিমুখ মন যার সেই মূর্খ।

প্রশ্ন কে শত্রু আর কে মিত্র ?

উত্তর : ষড়রিপুই শত্রু গুরুই মিত্র।

শ্রীশ্রীরামঠাকুর ভক্তজন সমক্ষে শুধু ধর্ম আলোচনাই করতেন না। সময় সময় তিনি এমন হাস্যরসের অবতারণা করতেন যে সবাই হেসে গড়াগড়ি যেত।

এক ভক্তের বাড়িতে বসে তিনি বললেন, একবার ট্রেনে করে চলেছেন। গাড়িতে বেশি ভিড় নেই। হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছ ঘেঁসে বসলেন। অন্তর্যামী ঠাকুর তাঁর পাশে বসাটা অনুমান করলেন। এক ভক্ত কয়েকদিন আগে একটা মানিব্যাগ কিনে দিয়েছিলেন। ব্যাগটা তাঁর ফতুয়ার মধ্যে ছিল। ভদ্রলোক বার বার পকেটের দিকে তাকাচ্ছেন। ঠাকুর আলগোছে ব্যাগটা একটু উঁচু করে রেখে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

পরের স্টেশনে ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে নেমে গেলেন।

ট্রেন ছেড়ে দিল।

রামঠাকুর বলে উঠলেন, 'হ্যাগা আমার মনিব্যাগটা ভদ্রলোক নিয়ে নেমে গেলেন। ওতে গোটা কুড়ি টাকা ছিল।'

একজন বলে উঠলেন, 'তা একটু আগে বললেন না কেন ? ঠিক ধরে ফেলতাম ঐ পকেটমারটাকে।'

একটু থেমে ঠাকুর বললেন, 'ছিঃ ছিঃ উনি পকেটমার হতে যাবেন কেন ! ভদ্রলোকের সংসারে বড় টানাটানি চলছিল, দরকার পড়েছিল নিয়ে গেছেন। তাছাড়া উনি যখন আমার পাশে এসে বসলেন তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ব্যাগটি ওর দরকার। যাকগে ভদ্রলোকের উপকার হল।'

অন্যান্য ভক্তরা তো হেসেই খুন।

এমনধারা মানুষ কোথায় মেলে।

এর নামই কাঙালের ঠাকুর। তাঁর চোখে সবাই সমান।

এমন সময় সেই বাড়িতে আর একজন ভক্ত এসে করজোড়ে প্রার্থনা জানালেন, বাবা কাল আমার মায়ের শ্রাদ্ধ। কৃপা করে যদি আমাদের বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দেন তাহলে কৃতার্থ হব। রামঠাকুর একটু হেসে বললেন, 'শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন তো কুকুরে খায়।'

এই কথায় সবাই হেসে উঠলেন।

তিনি বললেন, 'আচ্ছা এখন তো যান, নিমন্ত্রণ তো পেলাম। কাল দেখা যাবে।'

ভক্তটি প্রণাম করে চলে গেলেন।

পরদিন শ্রাদ্ধবাসর জমজমাট।

গীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ হচ্ছে। লোকজনের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। ভক্তটি বেশ খরচ করেই মায়ের শ্রাদ্ধ করছেন।

বাড়ির ভিতর একপাশে চরু রান্না হচ্ছে। ওখানে দুএকজন ছাড়া বিশেষ কেউ নেই। চরু নামানোর পর একটা পাত্রে রাখা হয়েছে ঠাণ্ডা করবার জন্য। সবাই ব্যস্ত নিমন্ত্রিতদের নিয়ে। গৃহকর্তা চারিদিকে তদারক করছেন। মায়ের শ্রাদ্ধ। সবাই সন্তুষ্ট হলে মায়ের আত্মার পরিতৃপ্তি হবে।

এমন সময় কোথা থেকে একটা কুকুর এসে সেই চরু খেতে শুরু করে দিল।

গৃহকর্তা কি কাজে ওখানে এসে কুকুরের চরুভক্ষণ দেখে রেগে একটা চেলাকাঠ ছুঁড়ে এমন ভাবে কুকুরটাকে মারলেন যে সে কেঁউ কেঁউ শব্দে সারা বাড়ির লোককে সচকিত করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল।

শ্রাদ্ধ মিটে গেলে ভক্তটি রামঠাকুরের কাছে গিয়ে অভিমানের সুরে বললেন, 'বাবা আমার মায়ের শ্রাদ্ধে ভেবেছিলাম আপনার পায়ের ধুলো পড়বে কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত হলাম।'

রামঠাকুর পা ঢেকে শুয়েছিলেন। গায় হাত পায় ব্যথার দরুন জ্বরও হয়েছিল।

তিনি একটু হেসে বললেন, 'গিয়েছিলাম ঠিকই, থাকতে পারলাম আর কই! চেলাকাঠের ঘায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরতে হল।'

তিনি চাদরটা খুলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পাটা দেখিয়ে দিলেন, ভক্তটি বাকশক্তি হারিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

এ কথা রাষ্ট্র হতে দেরী হল না।

রামঠাকুর পরদিন কোথায় যে চলে গেলেন কেউ তা জানল না।

আজকের মানুষের গগনচুম্বী অহঙ্কার ও অর্থলোলুপতা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে তা একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। দেহের রোগ শুধু রোগ নয়, বড় ব্যাধি হচ্ছে নিজেকে বিস্মৃত হওয়া। এই ব্যাধিতে ভুগে ভুগে মানুষ আজ শেষ হয়ে গেল। এ ব্যাধি স্বামী স্ত্রীতে মিল নেই, পুত্র কন্যা অবাধ্য, সংসারে নানা অশান্তি।

এ ব্যাধিরও ওষুধ আছে।

সে ওষুধ নামাশ্রয়। যুগে যুগে কালে কালে এই মহানাম আশ্রয় করে ভবসিন্ধু পার হয়েছেন অনেক মানুষ।

রামঠাকুর তাই জোর দিয়েছিলেন নামের ওপর। তিনি বলতেন, নামজপ, আত্মসমর্পণ আর সত্যনারায়ণ সেবা এই যে ঠিকমত করতে পারে তার আর কোন ভাবনা থাকে না। নাম যেখানে, নামরূপী ভগবান সেখানে।

জ্বালাযন্ত্রণা, রোগভোগ এমন কি পুত্রশোকও ভুলিয়ে দিতে পারে এই নাম।

শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রভু কীর্তনানন্দে মেতেছেন। শ্রীবাসও নাম কীর্তন করছেন। আনন্দে নাচছেন। নামের ঢেউ বয়ে চলেছে সারা

অঙ্গনে। একটু আগেই শ্রীবাসের একটা ছেলে মারা গেছে। শ্রীবাস কিছুমাত্র বিচলিত নন। তিনি মহানন্দে নাম সংকীর্তনে মাতোয়ারা হয়েছেন।

হঠাৎ কি রকম ছন্দপতন হল।

মহাপ্রভু বললেন, শ্রীবাস মাঝে মাঝে নাম বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কেন? তোমার বাড়িতে কি কিছু ঘটেছে?

শ্রীবাস বললেন, হ্যাঁ প্রভু আমার ছেলে মারা গেছে।

তুমি তা বল নি কেন?

প্রভু! ছেলে তো আর ফিরবে না, কিন্তু আজকের এই নাম-কীর্তনের মাঝে নাম ও নামীকে পেয়েছি, এ মুহূর্ত চলে গেলে আর তা যদি না ফিরে পাই!

মহাপ্রভু শ্রীবাসকে জড়িয়ে ধরে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। একেই বলে নামের মাহাত্ম্য!

শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত ৺শরৎচন্দ্র গাঙুলীর বসতবাটি ভাঙনে ভেঙে নিয়ে গেলে তিনি খুব মুশড়ে পড়েন। পরে তিনি আর একটা সুন্দর বাড়ি অনেক টাকা খরচ করে করলেন।

রামঠাকুর একদিন সে বাড়িতে এলেন। শরৎবাবু খুশি মনে সব দেখাতে লাগলেন এবং বললেন, 'এখনও অনেক কাজ বাকী।'

ঠাকুর আনন্দিত ভাবে বললেন, 'বাঃ বেশ বাড়ি হয়েছে। এ জায়গাটাও বেশ ভাল।'

শরৎবাবু আবার অনুরোধ করলেন, বাড়ি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তাঁকে কিন্তু একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে।

এ ঘটনার পর বছর দশেক কেটে গেছে। পরিবর্তনশীল জগতে কত পরিবর্তন হয়েছে। কত ঘর উঠেছে, কত ঘর ভেঙেছে, কতজনে

হেসেছে, কতজনে কেঁদেছে। সুখদুঃখের দোদুল দোলায় দুলতে দুলতেই তো এমনি ভাবে মানুষের দিন যায়।

ঠাকুর তখন চট্টগ্রামে বিধুভূষণ বসুর বাড়িতে অবস্থান করছেন। এ সংবাদ পেয়ে শরৎবাবু চট্টগ্রাম এলেন ঠাকুর সন্দর্শনে। ভেবেছিলেন ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে কিছুদিন তাঁর বাড়িতে রাখবেন।

কথায় কথায় শরৎবাবু রামঠাকুরকে বললেন, 'এবার দয়া করে আমার বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দিন। বাড়ি যা হয়েছে দেখবার মত। যে দেখে সেই তাকিয়ে থাকে।'

রামঠাকুর হাসলেন। বললেন, কার বাড়ি! আপনার বাড়ি? বাড়ি আর কদিন বলুন। ক্ষেতে যখন ধান হয় তখন মানুষ তাকে বলে ধান ক্ষেত। আবার পাট লাগালে বলে পাট ক্ষেত। বাড়ি এখন থাক, নাম করুন.—কাজ হবে।'

আবার রামঠাকুর হাসতে লাগলেন।

তা পরবর্তী সময়ে তাঁর এই হাসির কারণ বোঝা গেল। এক-মাস পর হঠাৎ শরৎবাবু অসুস্থ হয়ে কয়েকদিনের মধ্যে সব কিছু ফেলে দেহত্যাগ করলেন। তার সাধের বাড়ি পড়ে রইল। রইল পড়ে বাগান পুকুর—কিছুই তিনি সাথে করে নিয়ে যেতে পারলেন না।

সবই তাকে রেখে যেতে হল।

কিছুই যখন থাকবে না তখন সবাই এই অনিত্য জিনিসকে সাজায় বেশি করে। যা চিরকাল থাকবে সেই নিত্য বস্তু ভগবানকে কেউ আঁকড়ে ধরে না। এইতো মানুষের স্বভাব।

এই আছে এই নেই। তাকে সাজানোর জন্য মানুষের কি আপ্রাণ চেষ্টা। অনিত্যর হাটে অনিত্য বস্তুর বেচাকেনা। এ ছাড়া আর কি!

যুগে যুগে এমনি ভাবে ঈশ্বরের প্রেরিত কত মহাপুরুষ আসছেন।

তাঁদের কথা কে শুনছে। কৃচ্ছসাধনের পর কৃচ্ছসাধন করে তাঁরা মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সবাইকে বাঁচাবার মন্ত্র নিয়ে।

কিন্তু দ্বার বন্ধ! তবুও তাঁরা দরজায় ঘা দিয়ে চলেছেন সব সময়। কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

একেই বলে মায়াবদ্ধ মানুষের আচরণ।

রামঠাকুরের মত শক্তিধর মহান সাধকের সংস্পর্শে এসেছেন, অনবরত তাঁর সঙ্গ করেছেন এমন মানুষ খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু কে জানে তাঁর কৃপা তাদের জীবনে কতখানি বর্ষিত হয়েছে।

যারা সেই রামকৃপা বর্ষণের বারিধারা সঞ্চয় করে রাখতে পেরেছেন তারা সব সুখে আছেন। শান্তিতে আছেন এই আমার বিশ্বাস।

নাম কোনদিন প্রবঞ্চনা করে না। আনন্দধামে তার বসতি অবশ্যই হয়। নামে যার আস্থা আছে ঈশ্বর অবশ্যই তার মঙ্গল করেন।

কি সে মঙ্গল!

সে মঙ্গল হচ্ছে যাতে সে নামামৃত সাগরে অবিরাম ডুবে থাকতে পারে। না ডুবলে তো রত্নের সন্ধান মিলবে না।

গুরুভক্তি কতখানি থাকলে তবে গুরু অদৃশ্য ভাবে শিষ্যের সঙ্গেই থাকেন, আপদেবিপদে গুরু শিষ্যকে রক্ষা করেন তা রামঠাকুরের জীবনে অনেকবার ঘটেছে।

গুরুতে যার প্রগাঢ় ভক্তি আছে ঈশ্বরেও তার সমান ভক্তি।

গুরুতে ভক্তি মানেই ঈশ্বরে ভক্তি।

শুধু এই গুরুভক্তির জোরেই দীর্ঘপথ তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই পরিক্রমা করেছেন। রামঠাকুরের জীবন গুরুময় জীবন। গুরু ছাড়া তাঁর দেহমন প্রাণ আর কিছুই জানে না।

গুরুকৃপা বলেই রামঠাকুর আজ জগৎপূজ্য।

শ্রীশ্রীরামঠাকুর এক জায়গায় ধীর ভাবে বসে থাকতে পারতেন না। ঘুরে বেড়ানই তাঁর অভ্যাস। যার ফলে তিনি বাতে বড় কষ্ট পেতেন।

তিনি পঞ্জিকায় একটা বিজ্ঞাপন দেখে সেই মতো নির্ধারিত টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, 'বলেছে তো যত পুরানো বাত হক সেরে যাবে। দেখা যাক না, না পারলে তো মূল্যই ফেরৎ দেবে।' যথাসময়ে ওষুধ এসে গেল। ব্যবহারও শুরু হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওষুধ শেষ হয়ে গেল তবুও রোগের কিছুমাত্র উপশম হল না। শেষে তিনি একজনকে পাঠিয়ে দিলেন টাকটা ফেরৎ আনতে। তিনি এসে বললেন, তাদের বক্তব্য পত্র মারফৎ জানিয়ে দেবেন বলেছেন। কিছুদিন পর সত্য সত্যই পত্র এল, তাতে লেখা আছে—আমাদের ওষুধ মানুষের জন্য, দেবতার জন্য নয়।

শীতকাল। প্রচণ্ড শীতের কোপে মানুষ জড়সড়। ফরিদপুর জেলার কনেশ্বর গ্রামের হেমচন্দ্র সরকারের সঙ্গে রামঠাকুর চলেছেন নোয়াখালি থেকে চট্টগ্রামে। তাঁর যাতে শীতে কষ্ট না হয় সেইজন্য তিনি ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত নোয়াখালির প্রখ্যাত সরকারী উকিল শ্রীশুভময় দত্তের কাছ থেকে একটা মহামূল্যবান কম্বল এনেছিলেন। ট্রেনে উঠে ঠাকুর সেই কম্বলখানা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। গাড়ির দরজা জানলা বন্ধ; কিন্তু মাঝে মাঝে জানলার ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা আসায় শীতের প্রকোপ প্রবলতর হল। রামঠাকুর শুয়ে আছেন।

হেমবাবু মাঝে মাঝে কম্বলটা দিয়ে ভাল করে ঠাকুরকে ঢেকে দিচ্ছেন। ট্রেন চৌমুহানীতে এলে ঠাকুর উঠে বসলেন। হেমবাবু তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, 'কোথায় এসেছি তাই দেখার জন্য উঠলাম।'

ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে উঠে এলেন গাড়িতে। পরনে সামান্য একটা জামা। শীতে সমস্ত শরীর তার কাঁপছে।

ঠাকুর ভদ্রলোককে ঐ অবস্থায় দেখে বড় অধীর হয়ে পড়লেন। বললেন, 'এদিকে আসুন, আমার এই পাশের জায়গায় বসুন।'

ভদ্রলোক ঠাকুরের পাশে এসে বসতেই গায়ের কম্বলটা খুলে তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আরাম করে বসুন, ভারী গরম।'

হেমবাবু কম্বলের দিকে তাকাচ্ছেন আর ভাবছেন কম্বলের ভবিষ্যতের কথা। কম্বলটা প্রায় যাবারই পথে। শুভময়বাবুই বা কি বলবেন।

এতসব ভাবছেন আর ঠাকুরের দিকে বার বার তাকাচ্ছেন। ঠাকুর মুখটা একটু কাঁচুমাচু করছেন। হেমবাবু বড়ই অস্বস্তি বোধ করলেন। যদি কম্বলটা চলে যায় তাহলে ঠাকুরের কি হবে? আব তো দ্বিতীয় কিছু নেই যা তিনি গায় দেবেন।

ট্রেন এসে লাকশাম জংশনে থামলে ভদ্রলোক কম্বলটা গায় দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন।

রামঠাকুর একটু ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে হেমবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কম্বলটা উনি নিয়ে যান, ওটা না হলে ওর বড় কষ্ট হবে।' পরে হেমবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি জানি আপনি অনেক কিছু ভাবছেন—শুভময়বাবুকে বুঝিয়ে বললেই হবে।'

ভদ্রলোক লাকশাম জংশনে কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নেমে গেলেন।

এমন দয়াল প্রেমময় এ দুনিয়ায় কজন মেলে।

চেনা নেই, জানা নেই, প্রচণ্ড শীতে অপরের দেওয়া কম্বল বিনা দ্বিধায় দিয়ে তিনি পরমানন্দ লাভ করলেন। নিজে যে এই প্রচণ্ড শীতে সারা রাত কষ্ট পাবেন সে চিন্তাও একবার করলেন না।

আমাদের প্রাণ আর ঠাকুরেব প্রাণে কত তফাৎ।

আমাদের প্রাণ বলে, অপরে কাঁদুক অপরে কষ্ট পাক, আর ঠাকুরের প্রাণ কাঁদে অপরের কষ্ট দেখে।

দুই প্রাণই প্রাণ।

এক প্রাণ হাসে আর এক প্রাণ কাঁদে।

এক প্রাণ নিষ্প্রাণ আর এক প্রাণ প্রাণবন্ত।

তাই রামঠাকুর আজ আশ্রয়দাতা আর আমরা আশ্রয়প্রার্থী।

পরের দুঃখে যাঁর প্রাণ কাঁদে, পরের ব্যথাকে যিনি নিজের ব্যথা বলে মনে করেন তিনি যেই হুন না কেন, সকলেরই প্রণম্য।

ঠিক এমনি ধারা এক করুণাময়ী তাপসীর কথা শুনেছি—তিনি মধ্যপ্রাচ্যের তাপসী রাবেয়া।

তিনি ঈশ্বরের কাছে এই ভিক্ষা চাইতেন, হে প্রভু! এ জগতের সবার চোখের জল আমার চোখে দাও। আমি সবার জন্য চোখের জল ফেলে অন্ধ হতেও রাজী আছি, যদি এ পৃথিবীর সবাই চোখের জল না ফেলে। তাঁর সাধনার শেষ স্তরে তিনি এমন জায়গায় পৌঁছেছিলেন যে নিজের দেহের মাংস কেটে কেটে জন্তু জানোয়ারদের খাওয়াতেন তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য।

এমন মানুষ এ দুনিয়ায় খুব বেশি মেলে না।

তা যদি মিলত তাহলে এ দুনিয়া স্বর্গ হয়ে যেত।

কবি নবীন সেন তখন নোয়াখালির ফেনী মহকুমার হাকিম। তিনি 'আমার জীবন' নামে একটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন।

সেই বইতে শ্রীশ্রীরামঠাকুর সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন:

'রামঠাকুর তখন ফেনীর জেলখানার সরকার। কত লোকে বলেছে, যে তিনি হয়ত জপ আহ্নিক করতে বসেছেন কিছু পরেই দেখা গেল তিনি আর সেখানে নেই। কেউ কেউ তাঁকে নিশিভোরে বৃক্ষ থেকে নামতে দেখেছেন। সাপ দংশন করতে আসছে। গরু মোষ তেড়ে আসছে রামঠাকুর বারণ করছেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চলে গেছে।

'তিনি নিজে কিছুই আহার করতেন না। কোনদিন হয়ত একটু দুধ, কোনদিন হয়ত একটু ফল খেয়েই তাঁর আহার হয়ে যেত। শহরের বারাঙ্গনাদের প্রতিও তাঁর মমত্ববোধ ছিল। ঘৃণা করা দূরে থাক, তিনি তাদের পরমাদরে নিজ মাতৃজ্ঞানে সেবা করতেন।

সে সময় নোয়াখালির অদূরে ভবানীগঞ্জে গিয়ে স্টীমারে উঠতে হত। একদিন তিনি তাঁর এক আত্মীয়কে দীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করে ফেরার পথে রাত বেশি হওয়ায় এক মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়েন। গভীর রাতে রামঠাকুর দেখলেন যে তাঁর গুরুদেব সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। গুরুদেব বললেন, 'নির্জন মসজিদে তুমি ভীত হয়েছ দেখে আমাকে আসতে হল।'

আরও নানা কথা তিনি রামঠাকুরের শ্রীমুখে নিজে শুনেছেন। রামঠাকুর একবার শিবচতুর্দশীর দিন চন্দ্রনাথ যাবেন মনস্থ করলেন। কিন্তু ছুটি মিলল না। সেদিন নাকি বড় সাহেব পরিদর্শনে আসবেন। ফলে রামঠাকুর মনমরা হয়ে আছেন। হঠাৎ টেলিগ্রাফ এসে পৌঁছল। যে বড় সাহেব আসবেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল। তিনি মহানন্দে চন্দ্রনাথ রওনা হলেন। কিন্তু পথ ভুল করে পাহাড়ী রাস্তায় দিশেহারার মত চলতে লাগলেন। এমন সময় একজন সন্ন্যাসী এসে তাঁর সামনে বললেন, ভুল করে তুমি উল্টো পথে বহুদূর চলে এসেছ। আজ আর চন্দ্রনাথ পৌঁছানোর কোন উপায় নেই। এখান থেকে চল্লিশ মাইল পথ। সুতরাং সেদিন পৌঁছনোর কথা আসেই না। সন্ন্যাসী বললেন, তুমি আমার সঙ্গে এস। সন্ন্যাসী তাঁকে নিয়ে কি ভাবে যে পাহাড়ী পথে ঐ দিনই অর্থাৎ শিবচতুর্দশীর দিন সন্ধ্যার পূর্বে চন্দ্রনাথে এনে হাজির করলেন তা রামঠাকুর বুঝতে পারলেন না।

রামঠাকুর কৃশকায় ছিলেন। বার বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সামান্য লেখাপড়া করেছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্ম বিষয়ে সব কিছুই যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারতেন। ধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব তিনি বিশদভাবে সবাইকে হৃদয়ঙ্গম করিয়েছিলেন।

কবি নবীন সেন যেটুকু জানতে পেরেছিলেন তাই হয়ত ব্যক্ত করেছেন। জানি না আরও কত কি তাঁর অগোচরে ছিল।

শুধু ভেবে আশ্চর্য হতে হয় –সামান্য ইতর প্রাণীরা, বনের পশু মেনে নেয় তিনি কত বড় মানুষ। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি আছে, তাকে না

হয় বশ করা যায়। কিন্তু সমস্ত জীবজন্তুকে তিনি কি ভাবে বশে এনেছিলেন! ঈশ্বরদ্রষ্টা মানুষ ছাড়া এ সমস্ত সম্ভব নয়। এ জগতে সবাই সেই পরমদয়াল ভগবানের সৃষ্টি, এখানে কেউই যে অবহেলিত বা ঘৃণিত নয় : তা তিনি বারাঙ্গনাদের সেবা করে দেখিয়ে গেছেন।

চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর সানুদেশে শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের প্রধান মোহান্ত শুদ্ধাচারী সাত্ত্বিক শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, হালিশহরের ধর্মপ্রাণ হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহত্যাগের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় তখন সদ্য বিবাহিত। ঠাকুরকে অনেক অনুনয় করার পর তিনি এসেছেন নববধূকে আশীর্বাদ করতে। আজন্ম ব্রহ্মচারী রামঠাকুর আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করলেও সামাজিক লৌকিকতা রক্ষা করতে ঠিক গৃহী মানুষের আপনজনের মত সর্বত্র যেতেন।

কিন্তু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ইচ্ছে তাঁকে কয়েকদিন কাছে রাখবেন, তাঁর সঙ্গ করবেন—তা উপায় নেই। ঠাকুর যাবার জন্য ব্যস্ত হলেন এবং শ্যামাচরণকে বললেন, 'তৈরি হয়ে নিতে ; কারণ তাঁর বিশেষ কাজ আছে, যেতেই হবে।'

সবাই জানে তাঁর জরুরী কাজ কি! হয়ত কোথাও কাউকে নাম দিতে যাবেন আর নয়তো কারও রোগশয্যায় গিয়ে হাজির হবেন। রহস্যময়ের এ রহস্য বোঝা ভার।

সেইদিনই তিনি শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বাক্স-প্যাঁটরা বিছানা সমেত স্টীমারে গিয়ে উঠলেন। সারারাত কেটে গেল। পরদিন সকালে সবকিছু স্টীমারে রেখে গুরুশিষ্যে স্টেশনের ধারে গিয়ে চিড়ে দই মিষ্টি কিনলেন। রামঠাকুর সেইসব একটু স্পর্শ করে শ্যামাচরণকে বললেন, 'এখন আনন্দে এগুলোর সদ্ব্যবহার কর।'

রামঠাকুর বসে আছেন। শিষ্য শ্যামাচরণ পরিতৃপ্তি সহকারে

খেতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে স্টীমার বাঁশি বাজিয়ে ছেড়ে দিল।

কি সর্বনাশ। বাক্স-বিছানা সবই স্টীমারে রয়ে গেল। কি হবে? শ্যামাচরণের খাওয়া মাথায় উঠে গেল।

তিনি বিষণ্ণ মনে হাত গুটিয়ে বসলেন।

রামঠাকুর বললেন, 'যা হবার হবে, এখন খেয়ে নাও।'

কিন্তু শ্যামাচরণ আর কি খেতে পারেন। মনে মনে ভাবছেন, আজকের দিনটা মোটেই শুভ নয়। এরকমটি হবে জানলে তাঁরা স্টীমার থেকে নীচে নামতেন না।

রামঠাকুর বসে গুন গুন করছেন। এমন সময় তিনি সচকিত হয়ে বলে উঠলেন, 'দেখ তো ধোঁয়া কিসের। মনে হচ্ছে আমাদের স্টীমারটি বুঝি ঘুরে আসছে।'

সত্যি সত্যিই স্টীমারটি আবার ঘাটে এসে ভিড়ল।

ওঁরা তাড়াতাড়ি করে স্টীমারে উঠে দেখলেন তাঁদের জিনিসপত্র সব ঠিক আছে। পরে শোনা গেল প্রয়োজনীয় একটা ক্যাশ বাক্স ফেলে যাওয়ায় স্টীমারটিকে আবার ঘুরে আসতে হয়েছিল।

শিষ্য শ্যামাচরণ রামঠাকুরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। রামঠাকুরের চক্ষু দুটি মুদ্রিত।

তাঁর ধ্যানগম্ভীর মূর্তিকে শিষ্য মনে মনে বার বার প্রণাম করছেন। আত্মনির্ভরতা থাকলে বিপদে উদ্ধার করার মালিক যিনি, তিনি অবশ্যই সাহায্য করেন। রামঠাকুর যেন জানতেন যে স্টীমারটি আবার ঘুরে আসবে। তাই তিনি নির্বিকার চিত্তে বসেছিলেন।

ত্রিকালদর্শী মহাযোগী রামঠাকুর যে আধারে যে সত্তায় স্থিত তা আমরা বুঝি সে সাধ্য কোথায়!

গীতায় ভগবান বলেছেন—

"চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥"

অর্থাৎ সব কাজ আমাতে অর্পণ কর মনে মনে। আমাতে একনিষ্ঠ হয়ে সমস্ত বুদ্ধিরূপ যোগ অবলম্বন করে আমাতে চিত্ত স্থির রাখ। আমি তোমাকে সমস্ত সঙ্কট থেকে উদ্ধার করব।

শ্রীশ্রীরামঠাকুর তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বাইরে প্রকাশ হক চান নি। তিনি সব সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে নিরিবিলি থাকতেই ভালবাসতেন। ফেনীতে থাকাকালীন তাঁর বিভূতি আপনা আপনিই প্রকাশ হতে থাকে।

রামঠাকুরের আকর্ষণে মানুষের আশার অন্ত নেই। এই অলৌকিক মহিমা সম্পন্ন মহামানবকে দর্শনের কামনা কে না করে? দলে দলে মানুষ আসে যায়। তাদের কত কামনা-বাসনা। কেউবা কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে। কারও ছেলের চাকরী মিলছে না. কারও মেয়ের বিয়ে হয় না। সবার ধারণা রামঠাকুর সবকিছুই সমাধান করতে পারেন। কত লোকের শরীরে তিনি তাঁর কোমল হাত বুলিয়ে দিয়েছেন তাতেই তার দেহের ব্যাধি নিরাময় হয়েছে। এসব জেনেশুনে কে আর ঘরে বসে থাকে। তাই সবাই আসে রামঠাকুরের সান্নিধ্য কামনা করে।

এ কামনা করা তো নিরর্থক নয়।

দুঃখকষ্টে জর্জরিত মানুষ সংসারের যন্ত্রণাময় সাগরে অহরহ ডুবছে আর ভাসছে। কিনারা কোথায়?

অশান্তির মালা জপে যাদের দিন কাটে, ঝড়ঝঞ্ঝাময় বিক্ষুব্ধ জীবন সৈকতে যারা ঘর বেঁধেছে তারা কি করবে।

তাই সবাই ধারণা করে যে 'হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোনখানে' বুঝি সুখ আছে। সেখানে গিয়ে ঢাকনা খুললেই বুঝি সব সুখশান্তি আঁচলে বেঁধে নিয়ে আসতে পারবে।

ঠাকুর সবাইকে দর্শন দেন। সব কথা শোনেন। কোন বিরক্তি নেই। কোন উষ্মা নেই।

তিনি যেন বাঞ্ছাকল্পতরু। অকস্মাৎ ফেনীর চাকরী ছেড়ে দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ভক্তজন সমক্ষে তিনি বার বার বলেছেন, 'ভগবান সর্বজ্ঞ, সমভাবে নিরপেক্ষ শক্তি। তাঁর সূক্ষ্ম বিচার বুঝবার শক্তি জীবের নেই। তিনি মঙ্গলময়, তাঁকে ভুলেই কর্তৃত্বাভিমানে মানুষ অভাব শোকতাপ ভোগ করে থাকে। এ সংসার মায়াময়। অস্থায়ী নশ্বর প্রকৃতি দ্বারা গঠিত

'বার বার অদৃষ্টানুসারে জীবের সুখদুঃখ রূপ ফল লাভ হয়। কারোই কোন শক্তি নেই এ অমোঘ ভোগ খণ্ডন করে। সত্যই পরমপদ, সত্যকে ত্যাগ করবে না, সর্বদা মনকে সত্য পথে রাখতে চেষ্টা করবে।'

যুগে যুগে কালে কালে যে সব মহাপুরুষ ধরাধামে এসেছেন, তাঁরা কেউ হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে বসে একাগ্র সাধনা করে ঈশ্বর দর্শন করবেন বা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে জগৎপূজ্য হবেন এ কামনা পোষণ করেন নি। তাঁদের মূল লক্ষ্য জীবকল্যাণ।

শ্রীশ্রীরামঠাকুর তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা যে শক্তি ও জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, যে ভগবদসত্ত্বা তাঁর শিরা উপশিরায় জড়িয়ে গিয়েছিল অনায়াসে তাতে তিনি নিজে সবকিছু লাভ করে পরম সুখ ভোগ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। পরন্তু জীবের দুঃখে কাতর হয়ে দুঃখক্লিষ্ট মানুষের বেদনার অংশীদার হবার জন্য নেমে এলেন মানুষের দ্বারে দ্বারে। তাঁর শুদ্ধ ও পবিত্র দেহ কতবার আর্তজনের রোগ ধারণ করেছে তাঁর ইয়ত্তা নেই। তিনি কঠিন বাতরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কষ্টকর আমাশার আক্রমণে কতবার তাঁর জীবন সংশয় হয়েছে। তিনি নিজের দিকে কোনদিন তাকান নি। সবাই সুখে থাক। দুঃখকষ্টের নিষ্পেষণে কেউ যেন নিষ্পেষিত না হয়। পরমশান্তি তাদের সংসারে বিরাজ করুক, তারা যেন ঈশ্বরমুখী মন নিয়ে জীবন কাটায়। চোখের জলে তারা যেন ঈশ্বরের

রাঙাচরণ ধুইয়ে দেয়। অপরের কাজের ঋণের বোঝা তিনি নিজে শোধ করেছেন।

আরাধনা আর কাকে বলে!

সকলের তাপদগ্ধ জীবনের তাপে নিজে তাপিত হওয়াই ঈশ্বর আরাধনা। এই আরাধনাই রামঠাকুর জীবনভোর করে গেছেন। তাই আজ বিজ্ঞজন সমক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুররামচন্দ্রদেব এক জীবন্ত বিগ্রহ, এক মহাতেজময়ী সূর্য, এক প্রজ্বলিত আলোকবর্তিকা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাবারি সবার ওপর ঝরে পড়ুক এই আমার কামনা, বাসনা, প্রার্থনা।

হে দয়াময়! দয়া যারা করতে জানে না তাদের হৃদয়ে দয়া দান কর। দয়া যারা পায় না তুমি তাদের দয়া কর।

"যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে"।

তেমনি ভাবে সবাই যেন সব সময় তোমাকে দর্শন করতে পারে।

নিকুঞ্জকুমার মুখুটি ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীরামঠাকুর মাঝে মাঝে এসে নিকুঞ্জবাবুর বাসায় অজ্ঞাতবাস করতেন। মুখুটি মশায়ের ছেলেরা ঠাকুরকে বলেন, 'ভক্তরা আপনার দর্শনপ্রার্থী হয়ে এলে আমরা কি করে তাদের মিথ্যে কথা বলে ফিরিয়ে দেব, কি করে বলব যে তিনি এখানে নেই। আমরা কি তাতে মিথ্যাবাদী হব না।'

ঠাকুর একটু হেসে বললেন, 'তোমরা দিনে রাতে কটা মিথ্যে কথা বল, তার কি হিসেব রাখ। তোমাদের বাবাকে অপমান ও গঞ্জনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য না হয় আর একটা মিথ্যে কথা বললে।'

ঠাকুরের এই উক্তিতে তাদের মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস অনেকটা কমে গিয়েছিল।

একবার পূজার সময় বিলাত থেকে স্তুইস্ মটর আসছিল।

সে সংবাদ নিকুঞ্জবাবু পেয়ে গিয়েছিলেন। ওটা এসে গেলে এবার পূজার প্রাক্কালে বেশ ভালই রোজগার হবে। হঠাৎ সংবাদ এল ঐ জাহাজটি জার্মান টর্পেডোর আঘাতে সমুদ্রে ডুবে গেছে। নিকুঞ্জবাবু অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ঠাকুরকে জানালেন সে কথা। তাঁর ছোট মেয়ে নীলু সেখানে খেলা করছিল।

ঠাকুর নীলুকে দেখিয়ে বললেন, 'ওকি জানে ওর খাওয়া পরা কি ভাবে চলছে!'

'না তা জানবে কি করে?'

ঠাকুর বললেন, 'সে তো জানে তার বাবা আছে কি খাবে কি পরবে সে ভাবনা তো তার বাবার। বাবা কোথায় পাবে, কি ভাবে আনবে তার সে কি জানে। আপনি জেনে রাখুন, নীলুর জন্য যেমন আপনি চিন্তা করছেন তেমনি আপনার জন্যও আর একজন চিন্তা করছে, তিনি তাঁর দৃষ্টি অবশ্যই আপনাতে নিবদ্ধ করে রেখেছেন। আপনার কাজ আপনি করে যান, কি হয় না হয় তিনি দেখবেন।'

শুইস্ মটর সমুদ্রে ডুবে গেলেও সেবার অন্য সূত্রে নিকুঞ্জবাবুর যা লাভ হয়েছিল তা পূর্ব লাভের চার পাঁচ গুন হবে।

ঠাকুরের কথাই ঠিক হল—কাজ করে যান যে দেখবার সেই দেখবে।

নিকুঞ্জবাবুর ঘরে একটা রামকৃষ্ণদেবের ছবি ছিল।

কি ভাবে একদিন সেটা খুলে গিয়ে মেঝেয় পড়ে সারা ঘরে কাঁচ ছিটকে পড়ল। ঠাকুর সেই কাঁচ কুড়োতে কুড়োতে হঠাৎ কেঁদে উঠলেন, 'রামকৃষ্ণদেব চলে গেলেন।'

এই ঘটনার কয়েকদিন পর ঠাকুর আবার বললেন, 'সেদিন রামকৃষ্ণদেব চলে গেলেন। আজ আবার জয়মালাও যায় যায়।'

জয়মালা নিকুঞ্জবাবুর পাঁচ বছরের মেয়ে।

তিনি কিছু বুঝতে না পেরে অজানা আশঙ্কায় কাঁপতে লাগলেন।

সত্য সত্যই অঘটন ঘটে গেল।

জয়মালা কদিন রোগভোগের পর সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে চলে গেল।

ঠাকুর তখন সেখানে ছিলেন না।

নিকুঞ্জবাবুর বাড়ি শোকে ডুবে আছে। সকলেই পাগল। শোক সামলাতে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। হঠাৎ ঠাকুর এসে পৌঁছালেন। তিনি অন্তর্যামী – কোন কিছুই তার অবিদিত নয়।

তিনি এসেই বললেন, 'যতদিন পৃথিবী থাকবে জয়মালারা আসবে আর মর্মান্তিক আঘাত হানবে। এ রোধ করার শক্তি কারও নেই। বাপ-মা পরের গচ্ছিত জিনিস চৌকিদারের মত চৌকি দেবে। সময় হলে যার জিনিস সে নিয়ে যাবে। এ নিয়ে দুঃখ করে কোন লাভ নেই। যা চিরকাল থাকবে তার জন্য চোখের জল ফেলাই শ্রেয়।'

৺সতীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী তখন কলকাতায় থেকে লেখাপড়া করছেন। রামঠাকুর সেই যে ফেনী ত্যাগ করেছেন তারপর থেকে কেউ আর তাঁর সন্ধান পায় নি। কোনদিন কেউ তাঁকে সন্ধান করার চেষ্টা করে নি। কারণ সবাই জানেন যে তাঁর গতিবিধি বোঝা খুবই কষ্টকর।

তার চেয়ে তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন এইভাব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা ভাল। যিনি ধরা না দিলে, ধরা যায় না তাঁকে ধরার চেষ্টা করা বৃথা।

মা যশোদা বালককৃষ্ণকে ধরার জন্য ছোটাছুটি করছেন। কি এক অন্যায় কাজ করেছেন বালককৃষ্ণ তাই তিনি তাঁকে শাস্তি দেবেন। ছোট একটা যষ্টি নিয়ে যশোদা তাড়া করেছেন কিন্তু বালককৃষ্ণ হেসে লুটোপুটি। মা যশোদা ক্রোধে অগ্নিশর্মা, আজ তাঁকে ধরতে পারলে চরম শাস্তি দেবেন এই ভাব। সারা শরীর তাঁর ক্লান্ত—সমস্ত শরীর দিয়ে তাঁর ঘাম ঝরছে।

বালককৃষ্ণ লুকোচুরি খেলছেন আর মজা দেখছেন।

কিন্তু মায়ের কষ্ট দেখে তাঁর দুচোখ জলে ভরে এল।

মা যশোদা তখন মনে মনে বলছেন, 'আর যে আমি পারি না ভগবান তুমি এর ব্যবস্থা কর।'

মা যশোদা যেই ভগবানের শরণাপন্ন হলেন অমনি এসে বালককৃষ্ণ মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যতক্ষণ তাঁকে তাঁর সন্তান ভেবেছেন ততক্ষণ ধরা দেন নি।

যেই উনি আত্মসমর্পণ করলেন সেই উনি ধরা দিলেন।

ভগবান এমনি ভাবে সর্বজীবের জন্য চোখের জল ফেলছেন।

ডাকার মত যে ডাকে তার কোলেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন।

রামঠাকুরও সেই ভগবদসত্ত্বা নিয়ে এসেছিলেন। তিনিই সেই ভাগবতী তনু।

কায়মনোবাক্যে যে ডাকে তার কাছে তিনি অবশ্যই আসেন।

সতীন্দ্রমোহন একদিন কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছেন। উদ্দেশ্য একটা ছাগ বলি দেওয়া।

হঠাৎ তিনি কার ডাকে সচকিত হলেন. 'সতীন্দ্র।'

পেছন ফিরে দেখেন রামঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন।

অকস্মাৎ তিনি কোথা থেকে হাজির হলেন! রামঠাকুর বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয় আমার সঙ্গে, পুজোর ও বলির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' রামঠাকুরের কৃপায় সতীন্দ্রমোহন পুজো ও বলিদান পর্ব শেষ করলেন। কালীঘাটের মন্দিরে সবাই তাঁকে যোগী বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ বলেই জানতেন।

ডিঙামানিকের ৺বরদাকান্ত ভট্টাচার্য সেই সময়ে কালীঘাটে থাকতেন। তিনিও রামঠাকুরের অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন। ঠাকুর এখানে গোপনেই বাস করতেন। এক বৈষ্ণবের পর্ণকুটিরে থাকতেন। জায়গাটা খুবই নির্জন। তিনি ঐখানে বসে পরমার্থ চিন্তায় ধ্যানস্থ হয়ে যেতেন।

একদিন এই কালীঘাট থেকে রামঠাকুর উধাও হয়ে গেলেন।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। সতীন্দ্রমোহন প্রবেশিকা পরীক্ষার দিন হেয়ার স্কুলের দিকে চলেছেন, মাথায় রাজ্যের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। কেমন প্রশ্ন হবে, কেমন তিনি উত্তর দেবেন, কে জানে।

ভাবতে ভাবতে তিনি হেয়ার স্কুলের গেটের কাছে এসেই বিস্ময়ে হতবাক। সামনেই দেখেন রামঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন সহাস্যবদনে। কি করে তিনি জানলেন যে সতীন্দ্রর হেয়ার স্কুলে সিট্ পড়েছে।

সতীন্দ্র তাড়াতাড়ি তাঁর পদধূলি ও আশীর্বাদ নিলেন। ঠাকুর শুধু বললেন, 'যা ভাল ভাবে পাশ করে যাবি।'

এই কথা বলেই তিনি আবার কোথায় যেন চলে গেলেন।

কয়েক মাস বাদে পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা গেল সতীন্দ্রমোহন ভালভাবেই পাশ করেছেন।

এ কেমন রহস্যময় মানুষ!

যাঁর কোন ঠিকানা নেই। যার গতিবিধির সঙ্গে কেউ পরিচিত নয়। অথচ সর্বত্র তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সমস্ত প্রয়োজনে হাজির হচ্ছেন।

কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ৺সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র রামঠাকুরের পরম ভক্ত ছিলেন। কলকাতার ভক্তমণ্ডলীতে তিনিই তাঁকে প্রথম পরিচিত করান। এইভাবে ধীরে ধীরে কলকাতায় বৃহৎ এক রামঠাকুর ভক্ত সমাজ গড়ে ওঠে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাঁকে দেখলে সাধু সন্ত বলে মনেই হত না। জটাজুটধারী কিংবা গেরুয়াধারী হলে মানুষ বেশি আকর্ষিত হয়। মানুষও জানতে পারে ইনি একজন সাধু ব্যক্তি। একে নাড়া দিলে হয়ত কিছু ফল মিলতে পারে। কিন্তু রামঠাকুরের এমন কোন চটকদার বেশ ছিল না, যার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সাধু সন্ন্যাসী

বলে মনে হবে। ক্যাম্বিসের জুতো পায়. গায় একটা ফতুয়া। পরনে একখানা সাধারণ ধুতি, গলায় তুলসীর মালা।

এ কি একজন সাধুর বেশ!

এক কাপড়েই তিনি কতদিন কাটিয়ে দিয়েছেন। তবু কাপড় ময়লা হয় নি, বা কোন দুর্গন্ধও বের হত না। বরং তা থেকে একটা সৌরভ ছড়িয়ে পড়ত।

এক কাপড়েই তিনি স্নান করে গায় শুকিয়ে নিয়ে পরতেন। তাঁর কাছে সবাই আপন, তাই তিনি সবাইকে আপনি বলে সম্বোধন করতেন।

কেউ প্রতিবাদ করলে বলতেন, 'আপনজনকেই তো আপনি বলে। এতে দোষ তো কিছু দেখি না।'

স্বর্গত মিত্র মহাশয়ের সিমলা বা দিল্লী থাকাকালীন সেখানেও রামঠাকুর যেতেন এবং সবার অন্তরালেই দিন কাটাতেন। এই বিরাট ভারতবর্ষের কত জায়গায় যে তাঁর পায়ের ধুলো পড়েছে তা বোধ হয় ঠাকুরের স্মরণ নেই। তিনি যে কখন কাকে কি ভাবে কৃপা করবেন তা কেউ জানতে পারত না। একবার তিনি তাঁর ভক্ত দুই ভাইয়ের সাংসারিক বিরোধ এমন ভাবে মিটিয়ে দেন যা শুনলে অবাক হতে হয়। দু ভাইয়ের বিষয় নিয়ে এমন বিরোধ হযেছিল যে তাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল।

একদিন রামঠাকুর কলকাতায় কোথায় যাবেন বলে গাড়িতে উঠছেন এমন সময় সেই ভক্ত এসে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

তিনি একটু হেসে বললেন, 'ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র ছিল, তার মধ্যে কিছু কিছু পুত্রের চরিত্রগত দোষ থাকার দরুণ দুষ্কৃতিকারী বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল কিন্তু একটা জিনিস তাদের ছিল তা হল ভায়ে ভায়ে গভীর মিল, যেন এক সুতোয় গাঁথা মালা। কোনদিন কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাটি বা কোন মতান্তর হয় নি।'

রামঠাকুরের এক কথাতে ভক্তটি এমন ভাবে লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেল যে তা আর বলার মুখ রইল না। মনের যত ময়লা সব যেন ঠাকুরের কথায় ধুয়ে মুছে গেল। ভ্রাতৃস্নেহে তাব মন এমন দুলে উঠল যে এরপর এতদিনের জমানো বিরোধ জন্মের মত মিটে গেল।

একটার পর একটা ঘটনার স্রোত। কত স্রোত মিলিয়ে গেছে তার হিসেব নেই। যার যা মনে পড়েছে, যে যা প্রত্যক্ষ করেছে তাই নিয়েই বোনা হয়েছে নামের নামাবলী।

সদগুরুর কাছে দীক্ষিত হলে পরমাত্মারূপী ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। রামঠাকুরের আশ্রিত যারা, তারা এই ভাবে দিনের পর দিন গুরুর মাঝে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ভাগ্যবান তাঁরা, তাই এমন গুরুর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এমন ঘাসের চেয়ে নিচু, তরুর চেয়ে সহিষ্ণু গুরু আর কোথায় মিলবে।

যারা এই বিরাট শক্তিকে অন্তরের সমস্ত ভক্তি উজার করে দিয়ে ধরতে পেরেছেন তাদের কোন দুঃখই তিনি রাখেন নি। একনিষ্ঠতা, অজস্র ভক্তি ও পবিত্রতা এই তিন যার ছিল তিনি অবশ্যই তাঁকে আঁকড়ে ধরতে পেরেছেন।

সংসারের ছোটখাট বিপর্যয়, আকস্মিক দুঃখকষ্ট ও শোকতাপের মাঝে তিনি সবার সবকিছু ভুলিয়ে দিয়ে নবজীবন দান করেছেন।

দুঃখকষ্ট যিনি দিয়েছেন, তিনিই আবার সে দুঃখকষ্ট লাঘব করেছেন।

শোকতাপ যিনি দেন তিনি আবার সান্ত্বনার প্রলেপ দেন।

এ বিশ্বাস যে রাখতে পারে সে ঠকেও ঠকে না।

মানুষের কত বড় বড় বিপদ এক এক নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে যায়। কত বড় বড় ব্যাধি এক এক লহমায় উপশম হয়ে যায়।

নাম হয় ডাক্তারের, কিন্তু ভগবান যে ডাক্তার রূপে এসে তাকে নিরাময় করলেন এ বোধ কজনার আছে।

ভগবানে শরণাগত হলে সব কিছুর ব্যবস্থা হয়।

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের পরম ভক্ত ডক্টর প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক। ঠাকুরের সামনে মাথা উঁচু করে কথা বলতে একমাত্র তিনিই পারতেন। ঠাকুর একমাত্র প্রভাতবাবুকে একটু সমীহ করে চলতেন। আত্মায় আত্মায় কতখানি মিল থাকলে তবে এমনি ধারা পরমাত্মীয় হওয়া যায়।

শীতের সময় ভক্তরা কেউ তাঁকে কম্বল, আলোয়ান, গরম জামা দিতেন কিন্তু ঠাকুরের কাছে তা বেশিক্ষণ থাকত না। কখন যে কাকে তিনি দিয়ে দিতেন তা কেউ জানতেও পারত না। এ নিয়ে ভক্তদের মধ্যে খুব অশান্তি হত। ঠাকুর বলতেন যে, 'দাতা যদি তাঁর দেওয়া জিনিসের ভবিষ্যৎ ভেবে দান করেন তাহলে তাঁকে দত্তাপহারী হতে হয়। দিতে তো সবাই পারে কিন্তু দান করতে পারে কজন!'

ভক্তরা আর কি বলবেন!

ঠাকুর যে কতখানি পরোপকারী ছিলেন তা একটা সামান্য ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। একবার একটা ছেলে তার একটা এফিডেফিটের ব্যাপারে ঠাকুরকে রাজী করিয়েছে আদালতে যাবার জন্য। তিনি গিয়ে সই না করলে তার এ কাজ উদ্ধার হবে না।

রামঠাকুর নির্দিষ্ট দিনে সময় মত সেজেগুজে বসে আছেন। এমন সময় প্রভাতবাবু হন্তদন্ত হয়ে তাঁর কাছে এসে বললেন, 'এত সকালে সাজগোজ করে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি!'

তিনি তো কোন কথাই বলছেন না।

সন্তান যেন পিতার কাছে ধরা পড়ে গেছেন।

পরে তিনি সব ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন।

এমন সময় সেই ছেলেটা এসে হাজির।

প্রভাতবাবু এবার ঠাকুরকে ছেড়ে ছেলেটিকে আচ্ছা করে বকে দিলেন—'তোমার সাহসের বলিহারি যাই, এই সামান্য কাজটা তো যাকে তাকে দিয়ে হতে পারে, তা না করে তুমি এঁকে নিয়ে যেতে এসেছ।'

ছেলেটি লজ্জিত হয়ে ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল।

প্রভাতবাবু ঠাকুরের দিকে চেয়ে পরে বললেন, 'ফের যদি কোনদিন এ ধরনের কাজে পা বাড়ান তাহলে পা দুটো কেটে রেখে দেব।'

রামঠাকুর সাজগোজ ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখ বুজলেন।

প্রভাতবাবু তাঁর কাছে এলে তিনি বললেন, 'আপনি আজ আমাকে বকলেন, তাই না।'

প্রভাতবাবু অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি বুঝি আপনাকে বকি।' তাঁর চোখের জলের ধারা কমে না। অবিরাম বয়ে যায়।

গুরুর সঙ্গে এমন ধারা সম্বন্ধ কজনার হয়। এমন আত্মিক সম্বন্ধ না হলে কি গুরুকৃপা পাওয়া যায়।

মন প্রাণ দিয়ে যাকে ভালবাসা যায় তাকে শাসন করা অবশ্যই যায়। সংসারী জীবের এ বোধ তো হয় না। গুরুকে বাঘ ভালুকের মত ভাবলে তো কোন সিদ্ধিই হবে না। গুরু হবেন সন্তানের মত, পিতার মত। গুরুকে তো জেনেশুনেই বরণ করা হয়েছে, গুরুও জেনে-শুনে গ্রহণ করেছেন। যে ভক্তি হলে গুরুকে আঁকড়ে ধরা যায়, সে ভক্তি প্রভাতবাবুর অবশ্যই ছিল। এই ভক্তির জোরেই বৃন্দাবনের গোপিনীরা বেঁধেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণ বাঁধা পড়েছিলেন কুন্তীর কাছে।

দুঃখের বিষয় বর্তমান প্রগতির যুগে ভক্তির নদীতে ভাঁটির টান পড়েছে।

যার ফলে মানুষ আজ অশেষ কষ্টকে বরণ করেছে।

গুরুশিষ্যের সে আগের মত সম্বন্ধ কোথায়!

কোথায় সে দিকদর্শক গুরু, আর কোথায় বা সেই ভক্তিমান শিষ্য।

ডক্টর প্রভাত চক্রবর্তী প্রকাশিত 'তাঁহার কথা' পুস্তক থেকে রামঠাকুর সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়।

শ্রীশ্রীরামঠাকুর সম্বন্ধে যাঁরা কিছু বলবার বা লিখবার ইচ্ছা প্রকাশ

করেন, তাঁদের বিভিন্ন বই বা যাঁরা ঠাকুরের সঙ্গ করেছেন এবং আজও জীবিত আছেন তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়। আমিও তাই শরণ নিয়েছি তাঁদের।

যে মহাপুরুষের জীবনের দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারেন না—তাঁর সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ভাবে কোন কিছু লেখা খুবই কষ্টকর। তাই যা আছে বা যেটুকু পাওয়া যায় তাই নতুন ভাবে পরিবেশন করা ছাড়া উপায় নেই।

ডক্টর প্রভাতচন্দ্রের কথায়:

"ঠাকুরের কথা বুঝিবার সামর্থ্য কজনার আছে। যে মানুষটিকে ধরা যায় না তাঁর কথা বুঝি এমন ক্ষমতা আমার নেই। মানুষটিকে চিনি নাই, বুঝি নাই। শৈশব হইতেই যাঁহার জীবন গভীর রহস্যে ভরা তাঁহার কথা যে কিছুই বুঝিব না ইহাই সত্য, তিনি বলিতেন একেবারে কিছু বুঝিতে না পারাই সব চেয়ে ভাল বোঝা। অজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। লোকে বলে বোধোদয় পড়িবার সময়ই তাঁহার বোধের উদয় হইয়াছিল। শত অভাবের মধ্যে থাকিয়া তিনি স্বভাবকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার মহান জীবনের এই ছিল মূলমন্ত্র। সুখদুঃখের দুরন্ত ঢেউয়ের মাঝে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেন তাই তিনি মহাযোগী, তাই তিনি সিদ্ধসাধক। তিনি সদগুরু লাভ করিয়া সারা জীবন সৎ এর আরাধনা করিয়াছিলেন। কঠোর সাধনা না করিলে পরমার্থ লাভ করা যায় না। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তিনি গভীর সাধনায় নিমগ্ন হইয়া সিদ্ধিলাভ করেন। এমন জীব হিতৈষণা মহামানব তিনি ছিলেন যে জীবের দুঃখে তাঁহার হৃদয় অবিরাম বিগলিত হইত। জীবজগতে ভগবান বিমুখতা প্রবল দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। কিভাবে সকলের মঙ্গল হইবে, কিভাবে তাঁহারা পরম সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া হৃদয়রাজ্য স্বর্গালোকে ভূষিত করিবে এই ভাবনাতেই তাঁহার সময় কাটিত। এই পরমসত্য যাহাতে সবাই উপলব্ধি করিতে পারে এই কারণে তিনি মানুষের দ্বারে দ্বারে কাঙালের মত ঘুরিয়া

বেড়াইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কেহ বুঝিতে পারিল না। যাহারা একটু-আধটু বুঝিল তাহারা কর্মদোষে কিছুই করিতে পারিল না। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় যাহা কিছু লাভ করিয়াছেন তাহাই ঝুলি ঢালিয়া সবাইকে দিতে চাহিয়াছেন কিন্তু কজন তাহা গ্রহণ করিতে পারিয়াছে? যাহারা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে তাহারা সুখসাগরে নিয়ত অবগাহন স্নান করিতেছে। নিজে শান্ত হইতে না জানিলে শান্তি পাওয়া যায় না ইহাই তাঁহার বেদবাণী।

"বারবার তিনি বলিয়াছেন—নিত্য বস্তুর সঙ্গে সঙ্গ না করিলে দুঃখের হাত এড়াইতে পারিবে না। নিজে কর্তা এই ভাব ত্যাগ করিলে শান্তি পাইবে। নিত্য বস্তু কি! যাহাকে কোনদিন ত্যাগ করা যায় না তাহাই নিত্যবস্তু। এই নিত্য সেবা করাই ধর্ম। বৈষ্ণবেরা বলেন—'আশ্রয় লইয়া ভজে কৃষ্ণ তারে নাহি ত্যাজে।'

প্রভাতচন্দ্র শেষে বলিয়াছেন—"তাঁহার সহিত যে কি সম্বন্ধ তাহা জানি না। জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহাকে বড় ভাল লাগে। প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। তাঁহার কি শক্তি আছে জানি না তবে সবাই আকৃষ্ট হয়। একবার দেখিলে মন প্রাণ তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।"

প্রভাতচন্দ্র যা বলেছেন তার চেয়ে সত্য আর কি থাকতে পারে! সত্যময় জীবন যাঁর তাঁর কথা কি বলে কেউ শেষ করতে পারে। কৃষ্ণকথা এক জনমে শেষ করা যায় না। কৈবল্যনাথের কথাও বলে শেষ করব এমন কালিকলম কোথায় পাব! যেটুকু বলে চলেছি তাঁর কৃপা বলেই। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করা ছাড়া আর উপায় কি!

আমি তাঁকে দেখি নি, তাঁকে বুঝি নি কিন্তু তাঁর কথা শুনেছি, তাঁর কথা ভেবেছি, তাঁর নামে কলম ধরেছি, তাঁরই কৃপাবলে, একথা চন্দ্র-সূর্যের মত সত্য।

একবার শ্রীশ্রীঠাকুর শহরতলীতে এক ভক্তগৃহে অবস্থান করছেন। ভদ্রলোকের ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হচ্ছে। মেয়েটি শিক্ষিতা সুন্দরী। তিনি ঠাকুরের কাছে এ বিয়ে সম্বন্ধে মতামত চাওয়ায় ঠাকুর বললেন, 'এ বিয়েটা না হওয়াই ভাল, এতে ভাল হবে না।'

ভদ্রলোক তাঁর এক বন্ধুকে ঠাকুরের এই বক্তব্য বলায় তিনি বললেন, 'ঠাকুর সন্ন্যাসী মানুষ, সংসার সম্বন্ধে ওঁর কি অভিজ্ঞতা আছে? বিয়ে থা সম্বন্ধে ওঁর মতামতের কোন গুরুত্ব না দেওয়াই উচিত। আপনি বিয়ের ব্যবস্থা করুন। শুভকাজে দেরী করলে ফল ভাল হয় না।'

কয়েক মাস বাদে ঠাকুর উক্ত ভদ্রলোকের গৃহে এসে পুত্রবধূর খোঁজ কবায় জানলেন বধূমাতা পিত্রালয়ে গেছে।

ঠাকুর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দেখা হলে বড় ভাল হত।' তিনি এক টুকরা কাগজে কি একটা লিখে খামের মুখটা এঁটে গৃহকর্তার হাতে দিয়ে বললেন, 'খামটা বধূমাতা এলে তার হাতেই দেবেন, অন্য কেউ যেন না দেখেন।'

কিছুদিন পর বধূমাতা এলে তার হাতে খামটা দেওয়া হলে তিনি পরম বিস্ময়ে দেখলেন যে ঠাকুর তাকে কৃপা করে নাম দিয়েছেন।

নাম প্রাপ্তির কয়েকদিন পর সাংসারিক কি একটা অশান্তিতে বধূমাতা আত্মহত্যা করলেন।

মৃত্যুর আগে নাম প্রাপ্তি হওয়াতে তার আত্মা যে পরম শান্তি লাভ করবে এ বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ হলেন।

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের এক ভক্তের আত্মীয় বি. এ পরীক্ষা দেবার পর চাকরীর সন্ধান পায়। চাকরীটা তার হবে কিন্তু পাশ করলেই তা সম্ভব হবে। আত্মীয়টি অনেকের কাছে ঠাকুরের নাম শুনেছিল। একবার তাঁর কাছে গেলে কেমন হয়। পাশ তো সব বিষয়ে হবে। কিন্তু সংস্কৃততে একটু সন্দেহ আছে হয়ত সংস্কৃতে সুবিধা হবে না। এ ফল

হবে ভয়াবহ —সংসারের যে পরিস্থিতি তাতে এ চাকরীটা না হলে সবশুদ্ধ না খেয়ে মরা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে উক্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে গিয়ে সব কিছু নিবেদন করল।

ঠাকুর বললেন, 'ওকে নিয়ে প্রভাতবাবুর কাছে যান।' প্রভাত চক্রবর্তী তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রধান পরীক্ষক।

প্রভাত চক্রবর্তী একটু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'ঠাকুর যা ইচ্ছে বলতে পারেন। ট্যাবুলেশন শেষ হয়ে গেছে, আমার কিছু করবার নেই।'

ছেলেটা অশ্রুসজল চোখে পুনরায় ঠাকুরের কাছে এসে দাঁড়াল। ঠাকুর বললেন, 'পাশ করবে, ফেলতো আমি দেখি না।'

ভক্তটি ছেলেটিকে বললেন, 'তোর চিন্তার কোন কারণ নেই —' ঠাকুর যখন বলেছেন তখন তুই ঠিক পাশ করবি।'

পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা গেল সে পাশ করেছে।

ছেলেটি এ সংবাদ ঠাকুরকে আগে দিয়ে প্রণাম করে এল।

নির্ভরতা থাকলে যে কোন ভাবনা থাকে না, এ ঘটনা তারই প্রমাণ।

করুণার অবতার রামঠাকুর ভক্তদের নানা রকম ওষুধ বলে দিতেন। কারও হাঁপানী, কারও জ্বর, কারও শূল ব্যথা এমনি ধারা কত ভক্ত এসে তাঁর কাছে ওষুধ ভিক্ষা করতেন। ঠাকুর বিনা দ্বিধায় প্রত্যেককে গাছগাছড়া বা অন্য কোন প্রক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতেন। কত রকমের ভক্তের কত রকমের আবদার। কারও মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরী, কারও মামলা। তিনি ধীর ভাবে সবার কথা শুনতেন। এ নিয়ে কোনদিন তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন নি।

যাঁরা ভক্তিভাবে তাঁর নির্দেশিত ওষুধ ব্যবহার করতেন কিম্বা উপদেশ শুনতেন তাদের রোগ অবশ্যই নিরাময় হয়ে যেত এবং কাজে সিদ্ধি হত।

একদিন তিনি ভক্তদের কথা শুনছেন।

এমন সময় একজন বি. এস-সি. পাশ ছেলে ঠাকুরকে বললেন, 'আমার পেটে একটা ব্যথা ওঠে মাঝে মাঝে ব্যথা যখন ওঠে তখন আমার কোন জ্ঞান থাকে না। আমি পেটের ছবি তুলেছি, বড় বড় ডাক্তারের ওষুধ খেয়েছি কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। আমি কি করব!'

ঠাকুর তার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার এ রোগ একেবারে সেরে যাবে যদি আপনি নিয়মিত আপনার ঠাকুর ঘরে বসে এবেলা ওবেলা নাম করেন।

ছেলেটি এর আগে কোনদিন হরির নাম করে নি বা সুর করে গাইতেও পারে না। তবুও সে ঠাকুরের নির্দেশ মত দুবেলা মন প্রাণ দিয়ে হরির নাম করতে শুরু করে।

কিছুদিন পর সত্য সত্যই ছেলেটির পেটের ব্যথা উপশম হয় আর দ্বিতীয়বার তাকে পেটের ব্যথায় কষ্ট পেতে হয় নি।

ছেলেটি আজও নিত্য দুবেলা হরির নাম করে কিনা জানি না তবে আমার ধারণা নাম সে ছাড়ে নি আর কোনদিন ছাড়তেও পারবে না। হরির নাম এমনই জিনিস যা বিনা পয়সায় মেলে।

পয়সার ওষুধে রোগ সারে না, কিন্তু হরির নামে রোগ সেরে যায়। নামের এমনই মহিমা যে কঠিন রোগও তার কাছে বশ হয়।

এই নাম নিয়ে যারা আছে তারা এ ধরাধামে এসে আসল জিনিস পেয়ে গেছে।

সে জিনিস কি? তা হল বিশেষ ভাগবৎকৃপা।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামেব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

নাম কর আর পান কর নামামৃত সুধা। এই সুধা পান করে মাতাল হও।

নামে একবার পাগল হতে পারলে মনের দরজার সব আগল খুলে যায়। নামের শরণ নিলে আর দুঃখকে বরণ করতে হয় না।

ঈশ্বর বিস্মরণ হয়েই তো জীবের এই দুর্দশা।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবকিছু থাকতেও আজ সে কত বড় অসহায়

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

নোয়াখালি জেলার চৌমুহানী রামঠাকুর ভক্তদের কাছে এক মহাতীর্থ। এখানেই ঠাকুর তাঁর জীবনের অনেকাংশ ও শেষাংশ কাটিয়েছেন। এতদিন তিনি জীবদ্দশায় একসঙ্গে কোথায় থাকেন নি। চৌমুহানীর কথা শুনলেই ভক্তদের অশ্রুসিক্ত হয় কারণ এইখানেই ঠাকুর অপ্রকট হয়েছিলেন।

ডিঙামানিকের নাম শুনলে তারা যেমন আনন্দে ভাসে তেমনি চৌমুহানী তাদের কাছে এক অশ্রুসিক্ত অধ্যায়। বাংলা ১৩৫৬ সালের ১৮ই বৈশাখ শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার এক পুণ্যক্ষণে ঠাকুর তার লীলাকাল সমাপ্ত করেন এই চৌমুহানীর মাটিতে। তাঁর মরদেহ সেখানে সমাধিস্থ করে তার উপর একটা মন্দির স্থাপিত করা হয়েছে। প্রতি বৎসর সেখানে তিরোধাম উৎসব পালন করা হয়।

ঠাকুরের বেদবাণীর এক জায়গায় একজন ইংরাজী অনুবাদ করেছেন।

'The world is a phantom play of exits and entrance, worked by nature with the strings of inpermanance and decay."

ডিঙামানিক আজ সেই প্রবেশ (entrance) আর চৌমুহানী হচ্ছে প্রস্থান (exit)। আমাদের জীবনের সকলেরই হয়েছে entrance। আবার একদিন আসবে (exit)। মাঝখানটা ফাঁকা।

চালাক যারা তারা ফাঁক বোজায় সৎকর্ম, সৎসঙ্গ, সদবৃত্তি দিয়ে, আর যারা বোকা তারা হেলায় ফেলায় সময় নষ্ট করে। ফাঁক ফাঁকই থেকে যায় তারপর একদিন জীবনের বৃন্ত থেকে আয়ুর ফুল টুপ করে ঝরে যায়। দুর্লভ মানব জনম লাভ করে অজ্ঞানের মত জীবনযাপন করে হিংসা পরশ্রীকাতরতায় দিন কাটিয়ে। নিজেকে ও অপরকে প্রবঞ্চনা করে শেয়াল কুকুরের মত মৃত্যুবরণে কি লাভ?

কাজের কাজ কিছু করে গেলে সাথের ভাল হবে।

দেশলাইয়ের খালি বাক্স হয়ে অবহেলিত ভাবে পড়ে থেকে কি লাভ? কাঠি যদি না থাকে তাতে, তাহলে আর জ্বলবে কি করে? আমাদের দেহমন ঐ খালি বাক্সের মত গড়িয়ে বেড়াচ্ছে এ ভব সংসারে। কেউ পা দিয়ে মাড়িয়ে চলেছে কেউ বা একপাশে ফেলে দিচ্ছে। শ্রদ্ধাপ্রেমের বারুদ কাঠি পুরে ঘসতে পারলে তবেই তো জ্বলবে।

আত্মারূপী ভগবান দেশলাইয়ের কাঠির মত হৃদয়ে বিরাজ করছেন। শুদ্ধ ও পবিত্র দেহ না হলে তো তিনি জ্বলে উঠবেন না।

ঐ আলোই তো আত্মজ্ঞান।

চৌমুহানী শহর এক বিরাট ব্যবসা ক্ষেত্র। এখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পাট সুপারী সরিষা রপ্তানী হয়। বহু বড়লোকের বাস এখানে। তাদের অধিকাংশই ঠাকুরের আশ্রিত ও দীক্ষিত। তার মধ্যে ৺উপেন্দ্রকুমার সাহা ও নরেন্দ্রকুমার ভুঁইয়া দুই মামাতো পিসতুতো ভাই, ভক্তজন মধ্যে ছিলেন ভক্তকুল চূড়ামণি। তাঁরা ঠাকুরের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। নিজের সুখ সমৃদ্ধির দিকে কোন সময় না তাকিয়ে এক মনে ঠাকুরের সেবা করে গেছেন। ঠাকুরের কোমল অঙ্গে একটা পিঁপড়ের আঁচড় লাগতে পারে নি কোনদিন এমন ভাবে তাঁদের দৃষ্টি ঠাকুরের প্রতি ছিল। এমন

নিঃস্বার্থ সেবা ভক্তের মত ভক্ত না হলে কে পারে? হয়ত এই কারণেই ঠাকুর দীর্ঘদিন তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন।

ঠাকুর যেখানে মানুষ সেখানে। সে সময় চৌমুহানীতে দিনরাত ভক্ত ও অনুরাগী দর্শকদের আনাগোনা ছিল। সারা দিনরাত কত লোকের আসাযাওয়া ছিল তা কেউ কোনদিন হিসাব করতে পারেন নি। যাঁরা আসতেন তাঁদের প্রত্যেককে প্রসাদ দিয়ে পরিতুষ্ট করা হত। অন্নভোগ ছিল নিত্যই। ফল-ফলারী মিষ্টান্নের তো কথাই নেই। দিনরাত সবাইকে তা বিতরণ করা হত। এইভাবে দুই ভক্ত অতিথি ভক্তদের আপ্যায়ন করে গুরুভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। অর্থ থাকলেই সবাই মানুষের সেবাযত্ন করতে পারে না। মানুষকে দেবতা জ্ঞানেও সবাই সেবা করতে সক্ষম হয় না। তাই সব মানুষের কাছে মানুষ আসে না, এটাও লক্ষণীয়।

অর্থবান হয়েও যারা পরমার্থ সঞ্চয় করছে তাঁরাই তো জানে সেবার মর্ম। গুরুগত প্রাণ উক্ত দুইজন পরকে আপন করে নিয়েছিলেন। আর এর মধ্যে দিয়েই তারা তাদের মূলধন বাড়িয়েছিলেন। তাঁরা দুইজনই ছিলেন ঐশ্বর্যবান, সব ঐশ্বর্য ছাড়িয়ে ছিল তাঁদের গুরুভক্তির ঐশ্বর্য।

উপেন্দ্রবাবু ও নরেন্দ্রবাবু দুজনের মধ্যে কেউ না কেউ অধিকাংশ সময়ই ঠাকুরের কাছেই থাকতেন। যাতে তাঁর কোন কষ্ট না হয় সেই কারণে তাঁর যা জিনিসের প্রয়োজন হতে পারে আগে থাকতেই তা সবকিছু সাজিয়ে রাখতেন। মুখ ধোয়ার জল থেকে শুরু করে যাবতীয় দরকারী জিনিস তাঁর ঘরে গোছান থাকত। ঠাকুর প্রতিদিন সকালে হাত মুখ ধুয়ে নিত্য ক্রিয়াদি শেষ করে মেঝেতে বসতেন। তাঁর দেহে থাকত শুধু একটা চাদরের আচ্ছাদন। ভক্তগণ একে একে এসে প্রণাম করতেন আর তিনি জয় গোবিন্দ বলে তাদের আশীর্বাদ বিলোতেন।

এ সময় তিনি প্রত্যেকের প্রশ্নের জবাব দিতেন।

বেশির ভাগ জবাবই ছিল শান্তির সন্ধানে মানুষ কিভাবে তৎপর হতে পারে সেই বিষয়ে। ভক্তরা নানাজনে ফল মিষ্টি প্রভৃতি ঠাকুরের জন্য নিয়ে আসতেন। ঠাকুর তা আবার উপস্থিত সবার মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

উপেন্দ্রবাবু ও নরেন্দ্রবাবু দুজনে আনন্দিত মনে এইসব দৃশ্য দেখে নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করতেন। আর ভাবতেন ঠাকুরের পায়ের ধুলো বাড়িতে পড়েছে বলেই তো এত মানুষের আসা ও যাওয়া। নইলে আর কে আসত!

উপেন্দ্রনাথ খুব মিষ্টভাষী বলে পরিচিত ছিলেন ভক্তসমাজে।

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন স্পষ্ট বক্তা। উপেন্দ্রনাথের মত জনপ্রিয়তা তাঁর ছিল না। তাই বুঝি ঠাকুর অপ্রকট হবার পর কয়েকমাস বাদেই নরেন্দ্রনাথ এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে ঠাকুরের চরণে আশ্রয় লাভ করেন। এ ঠাকুরেরই ইচ্ছা, কারণ তাঁর অনুপস্থিতিতে হয়ত পরম-ভক্ত নরেন্দ্রনাথের অমর্যাদা হতে পারে।

উপেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ যেন ঠাকুরের ডান হাত আর বাঁ হাত। ঠাকুরের কৃপাবারি তাঁদের মস্তকে যত বর্ষিত হয়েছে তত আর কারও ওপর হয় নি।

রামঠাকুর নিত্য খবরের কাগজ পড়তেন। দুপুরবেলায় তাঁর ভোগের আগে কেউ আসলে তাকেও পেট ভরে প্রসাদ খাইয়ে তবে ছাড়তেন। ভোগের দ্রব্যাদি উপেনবাবু ও নরেনবাবু গৃহভৃত্য দ্বারিকের সাহায্যে প্রস্তুত করতেন।

রামঠাকুর তখন কলকাতার জনৈক ভক্তগৃহে অবস্থান করছেন। এ সময় উপেনবাবুর স্ত্রী ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি তখন আসন্ন-প্রসবা। শরীর অন্যান্য ব্যাধিতেও আক্রান্ত। খুব যন্ত্রণা ভোগ করছেন। বড় বড় ডাক্তারের আনাগোনা চলছে। দামী দামী ওষুধও দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। দেখে শুনে একজন চিকিৎসক মন্তব্য করলেন যে প্রসবকালে উপেনবাবুর স্ত্রীর জীবন সংশয় হতে পারে।

উপেনবাবু উপায়ান্তর না দেখে কলকাতায় সস্ত্রীক চলে এলেন। ঠাকুরের কাছে স্ত্রীর কথা বলতেই তিনি বলে উঠলেন, 'সে কি এতখানি হয়েছে তা তো আমাকে আগে বলেন নি—তা এক কাজ করুন না, গরম মুড়ি খেতে দিন কিছুদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

উপেনবাবু ঠাকুরের কাছ থেকে ঘুরে এসেই এই নতুন ওষুধের কথা বলতেই তাঁর স্ত্রী পরম বিশ্বাসে সব ওষুধ সরিয়ে রেখে গরম মুড়ি আনিয়ে খেতে লাগলেন। দুতিন দিনের মধ্যেই তাঁর শরীর স্বাভাবিক হয়ে এল।

ভববৈদ্যের প্রেক্রিপশান কি বিফল হতে পারে। সব সংসারে এমনি ধারা বিশ্বাস যদি থাকে তাহলে আর বড় ডাক্তারের পিছনে অর্থ ব্যয় করতে হয় না। দেশে পাড়াগাঁয়ে আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করেছি যে গাছগাছড়াতে কত ব্যাধি নিরাময় হয়েছে।

কয়েকদিন পর উপেনবাবু ফিরে এলেন সস্ত্রীক চৌমুহানীতে। তাঁর স্ত্রী তখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শরীরের দুর্বলতাও অনেক কেটে গেছে।

উপেনবাবু ফেরার কয়েকদিন পর ঠাকুরও চৌমুহানীতে ফিরলেন। আবার গমগম করে উঠল বাড়ি। আবার মানুষের আসাযাওয়া শুরু হল। ঠাকুরের অমৃতবাণী শুনতে শুনতে কত সময় যে কাটত তা কারও খেয়াল থাকত না। ঠাকুর যেখানে, সেখানে নিত্য মেলা বসে।

এ মেলা পাঁপর ভাজার মেলা নয়। এ মেলা মাটির পুতুলের মেলা নয়। এ মেলা ভক্তিরসামৃত আস্বাদনের মেলা। এ মেলা মানুষ ও দেবতার মিলনের মেলা।

প্রতি সন্ধ্যায় ভিড় করে হত নামকীর্তন। স্তোত্রপাঠ ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাঠ। পাঠান্তে একসুরে সবার হরিনাম সংকীর্তনে সমস্ত বাড়িটা যেন আনন্দময় হয়ে উঠত। সারাদিন তো কাটে সুখদুঃখের পাঁচালী শুনে—এ সময়টা হরিনামে আনন্দ করা। মায়ার সংসারে বসবাস করে আনন্দ আর কতটুকু মেলে। সব ভুলে এক নতুন জগতে সময় কাটালে লাভ ছাড়া লোকসান হয় না।

খোলকরতালের শব্দে চারিদিক মুখর। সে এক আনন্দের হাট।

আনন্দময় ভগবানের রাজ্যে কিছুক্ষণ থেকে একটু আনন্দ আহরণ করা পরম সুখদায়ক। যে না এ সুখ আস্বাদন করেছে তাকে বলে বোঝান যায় না।

রাতে ঠাকুর কিছু মুখে দিতেন না। ঠাকুরকে রাতে শয়ান দিয়ে নরেন্দ্রবাবু নিজে ঠাকুরের পাশের ঘরে থাকতেন। ঠাকুর বোধ হয় রাত্রে ঘুমোতেন না। কত রাতে নরেন্দ্রবাবু শুনেছেন তিনি যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন। নরেনবাবু কত রাতে উঠে ভাল করে দেখেছেন কেউ এল নাকি! অথচ সব দরজাই তো বন্ধ। কারও আসার তো কোন লক্ষণই বোঝা যায় না! প্রায় প্রতি রাতেই তিনি শুনেছেন ঠাকুর কার সঙ্গে কথা বলছেন। যদিও সব কথা পরিষ্কার ভাবে তিনি বুঝতেও পারতেন না। লীলাময় ঠাকুর কখন কি ভাবে লীলা করেন তা কে বুঝবে!

প্রতি বছর নোয়াখালিতে প্রখ্যাত উকীল শুভময় দত্তের বাড়িতে মাঘী শুক্লাদশমীতে ঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব বেশ কদিন ধরে সম্পন্ন হত। দেশ-বিদেশ থেকে ভক্তরা এসে ঐ উৎসবে যোগ দিতেন। ঠাকুর এ সময় একবার উপেনবাবুকে বললেন, 'আপনি নোয়াখালি উৎসবে যান।'

উপেন্দ্রবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাকুর তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারেন, তাই বলেন, 'আপনার চিন্তা কি! স্ত্রীর জন্য ভাবতে হবে না, এ কদিন আমি সব চালিয়ে নেব।'

উপেনবাবু অভয়বাণী যখন পেয়ে গেলেন তখন আর চিন্তা কি! তিনি মহানন্দে উৎসবে চলে গেলেন। ঠাকুর সব কাজ নিজের হাতে করেন। বাড়িতে অন্যান্যরাও সুষ্ঠুভাবে সব কাজ করে চলেছেন ঠাকুরের নির্দেশ যথাযথ পালন করে। উপেনবাবুর আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর দিকে সবার সমান লক্ষ্য।

সবার এই ভাব—ঠাকুর যখন আছেন তখন আবার ভাবনা কিসের।

উপেনবাবু যাবার দুদিন পরই তার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করলেন নির্বিঘ্নে। সবাই আশ্বস্ত হলেন।

কেউ নিজের পূজা নিজেই করে এ ঘটনা কোনদিন দেখেছে? উপেনবাবুর অবর্তমানে পূজার্চনার ভারও ঠাকুর নিয়েছেন। তাই সকাল সন্ধ্যায় নিজ পটের সামনে বসে গভীর শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে উপেনবাবুর হয়ে পূজা করেন। ফুল বেলপাতা ও চন্দন দিয়ে নিজের পটকে নিজেই সাজান। বিড় বিড় করে কি সব মন্ত্র বলেন বোঝা যায় না। ধূপধূনা দিয়ে আরতি শেষে স্বীয় মূর্তিকে একটা প্রণাম করে পূজা সাঙ্গ করেন।

এমন পূজা দর্শন বহু ভাগ্যে মেলে। যারা দেখেছেন তাদের চোখ জুড়িয়েছে। জন্ম সার্থক হয়েছে।

কয়েকদিন পর উপেনবাবু ফিরে এলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করতে তিনি বললেন, 'এদিকে সব ঠিক আছে কোন চিন্তা নেই।'

উপেনবাবু শুধু বললেন, 'সবই জানি, শুধু আপনার পূজা দেখার সৌভাগ্য হল না। এ দুঃখ রাখার জায়গা নেই।'

ভক্ত নরেন্দ্রনাথ নিত্য সকালে ঠাকুরের সবকিছু গুছিয়ে রাখতেন। একদিন সকালে তিনি ঠাকুরের নিত্য কাজ গুছাতে ব্যস্ত এমন সময় একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে সংবাদ দিল যে বাজারে ভয়ানক আগুন লেগেছে। তিনি ছুট দিলেন কিন্তু কিছুদূর গিয়ে ভাবলেন তাইতো ঠাকুরের মুখ ধোয়ার জল তো রাখা হয নি। তিনি আবার বাড়ির দিকে দৌড় লাগালেন।

বাড়ি আসামাত্র ঠাকুর বললেন, 'এত হাঁপাচ্ছেন কেন! কোথায় গেছলেন?'

নরেনবাবু বললেন, 'বাবা বাজারে আগুন লেগেছে।'

ঠাকুর একটু বিরক্তির সুরে বললেন, 'তাতে আপনার কি?'

নরেনবাবু যেন এই কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হলেন।

আশ্চর্যের বিষয় যে নরেনবাবুর আশপাশ পুড়লেও তাঁর গুদামে

রাখা পাট ও সুপারী অক্ষত অবস্থায় রইল। তার গুদামের ধারে কাছেও আগুন আসে নি।

কৃপাময় ঠাকুরের কৃপাবলেই বুঝি নরেনবাবুর গুদাম সে যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিল।

ঠাকুরের কয়েকজন ভক্ত একবার ঠিক করলেন ঠাকুরের একটা বড় ফটো তুলতে হবে। এই ভেবে তারা একজন ভাল ফটোগ্রাফারকে নিয়ে এলেন। যথাসময়ে ঠাকুরকে একখানা পত্রপুষ্পশোভিত চেয়ারে বসিয়ে ফটো তোলার ব্যবস্থা হল। যতবারই ফটো তোলা হয় চেহারা মোটেই ফোকাসের মধ্যে আসে না। বারবার শট নেওয়া হল কিন্তু সেই একই অবস্থা। কিছুতেই ফোকাসের মধ্যে আনতে পারে না ফটোগ্রাফার।

ঠাকুর মিটিমিটি হাসছেন।

অবশেষে ঠাকুর নিজে উঠে ক্যামেরার কাছে এসে কালো কাপড়টা দিয়ে মাথা ঢেকে কিছুক্ষণ দেখে নিজের জায়গায় বসলেন, 'নেন এবার হবে।'

শট নেওয়া হল। এবার ফটো উঠল।

ফটোগ্রাফার বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা কি! তার কাছে নয়, এটা সকলের কাছেই একটা বিরাট বিস্ময় হয়ে রয়ে গেল।

বর্তমান নদীয়া জেলার গয়েশপুরে শ্রীশ্রীরামঠাকুরের এক বিরাট ভক্তমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় ঠাকুরের পরম অনুগত ডাক্তার যুধিষ্ঠির সিংহ নিজের বাড়িতে, শ্রীশ্রীঠাকুরের পট প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পূজারতি ও বাৎসরিক জন্মোৎসব করে থাকেন। তিনদিন ধরে উৎসব চলে। এখানে দেশ-বিদেশের মানুষ এসে জমা হয়। উৎসবের কয়েকদিন ধরেই নামসংকীর্তনে সারা গয়েশপুর মুখরিত হয়ে ওঠে। হাজার হাজার ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করে।

ঠাকুরের সঙ্গ করেছেন এমন মানুষ সেখানে খুঁজে পেয়েছি। তাঁরা হলেন শ্রীজগদীশ কর্মকার ও শ্রীরাজেন কর্মকার, সম্পর্কে দুজনে মামা ভাগ্নে। তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আমি ঠাকুর সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি।

জগদীশবাবুর মুখে শুনেছি—তিনি তখন চৌমুহানীতে সোনারূপার কাজ করতেন। উপেনবাবুর বাড়িতে নিত্য যেতেন ও ঠাকুরের সঙ্গ করতেন। তিনি একদিন চৌমুহানী বাজার থেকে একটা ভাল বেদানা ঠাকুরের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। যাবার সময় ভাবলেন, এই ফলটা ঠাকুরকে দিলে তিনি কতই না প্রীত হবেন। ঠাকুরের সান্নিধ্যে গিয়ে নীরদবরণ সাহা নামে এক ভক্তকে বেদানাটি ছাড়িয়ে দিতে বললেন। কিন্তু ছাড়াতেই দেখা গেল বেদানাটি সম্পূর্ণ পচা।

জগদীশবাবু বড় দুঃখিত হলেন। পরে আবার বাজারে গিয়ে আরেকটা বেদানা আনলেন। সেটা ঠাকুরকে দিতেই ঠাকুর একটু হাসলেন।

এ হাসির অর্থ সেদিন বোঝা যায় নি। আজ তার মানে স্পষ্ট। সেদিন তার ফল নিবেদনের মধ্যে অহংকার মিশ্রিত ছিল।

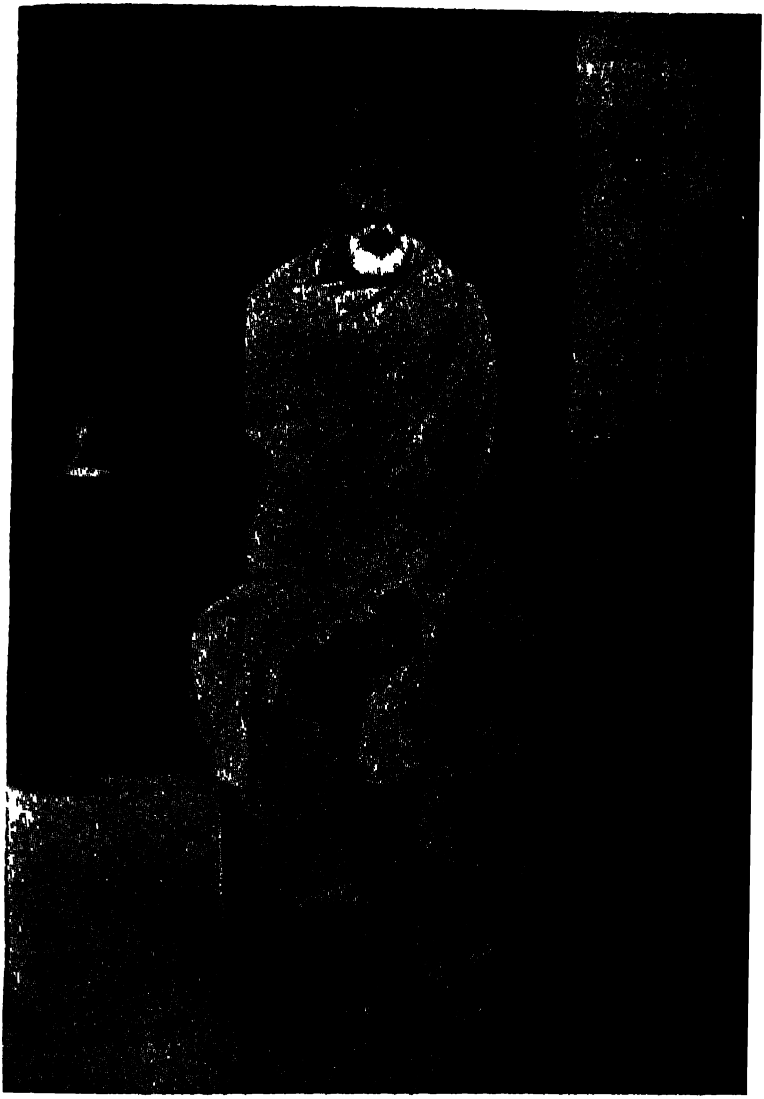
ঠাকুর একদিন জগদীশবাবুকে বললেন, 'পান বাদ দিয়ে আমাকে একটা হার করে দিন।'

তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'পান বাদ দিয়ে কোন সোনার গহনা তৈরি করা যায় এ আমার জানা নেই।'

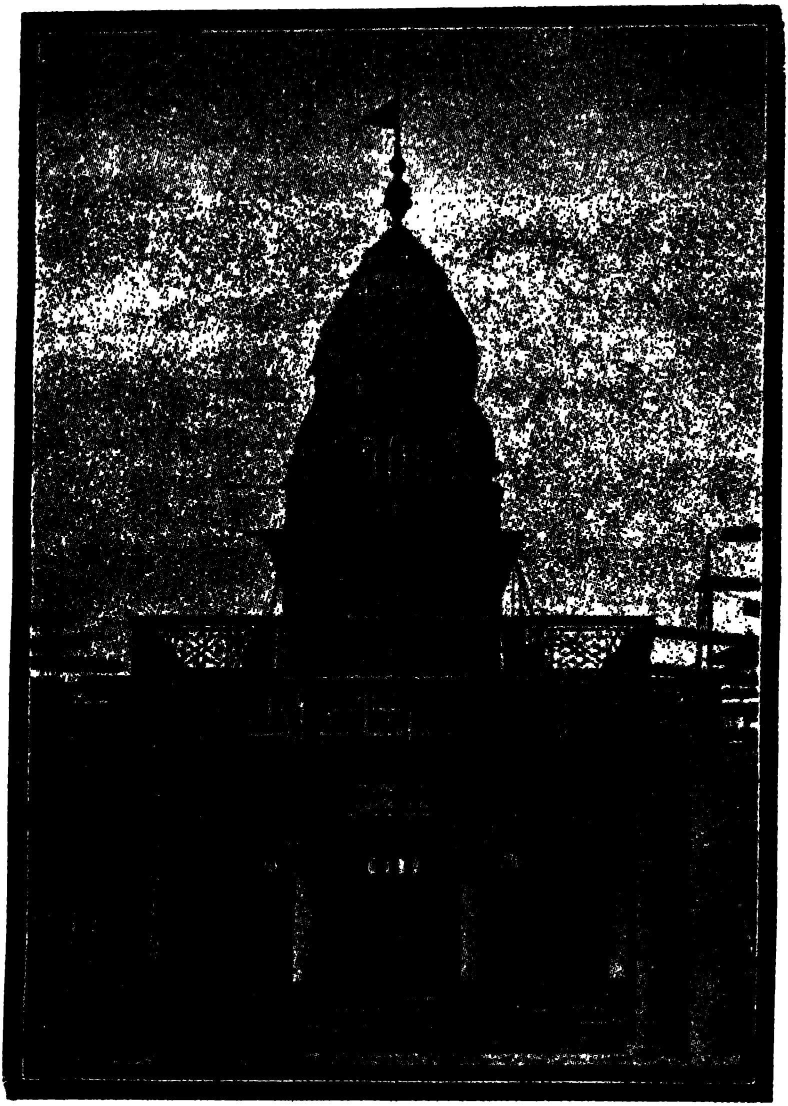
ঠাকুর বললেন, 'কে বললে হয় না, নিশ্চয়ই হয়!'

পরে তিনি তাকে নিয়মটা বলে দেওয়াতে জগদীশবাবু সেই ভাবে সোনার হার করে দিয়েছিলেন।

রাজেন কর্মকার বললেন, 'ঠাকুরের কথা বলি সে শক্তি আমার কোথায়! ঠাকুর যে দয়াময়, তা আমি বহুবার জেনেছি। একবার উৎসবের আগে আমার ভয়ানক জ্বর। মন অত্যন্ত খারাপ। এবার উৎসবে আর নাম গান করতে পারলাম না। উৎসব দেখাও ভাগ্যে



শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ



শ্রীশ্রীরামঠাকুরের সমাধি মন্দির
চৌমুহানী : নোয়াখালী

হল না। মনে মনে জ্বরের মধ্যে ঠাকুরকে অনবরত স্মরণ করছি।

ঠাকুরের দয়ায় একদিন আগে আমার জ্বর ছেড়ে গেল। যথারীতি উৎসবানন্দে মাতলাম। চারদিন ধরে কীর্তনানন্দে ডুবে ছিলাম। এতটুকু কষ্ট হয় নি।

সবই ঠাকুরের কৃপা।

ডাক্তার যুধিষ্ঠির সিংহ ঠাকুরের পরম ভক্ত। গয়েশপুরেই তিনি ডাক্তারী করেন আর ঠাকুর সেবা নিয়ে থাকেন। ঠাকুরের কৃপায় যে কতবার তিনি কত বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন তা বলার নয়।

প্রতি বৎসর নোয়াখালিতে শ্রীশুভময় দত্তের বাড়িতে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হয়। গয়েশপুর থেকে সব ভক্তরা টাকা পাঠাতেন নোয়াখালিতে।

সেবার ১৯৬৭ সাল, চালের দাম পাঁচ টাকা কেজি। বেশ কয়েক বৎসর ধরেই ঠাকুরের উৎসব গয়েশপুরে পালিত হচ্ছে। কিন্তু ১৯৬৭ সাল কি যে বার্তা বহন করে নিয়ে এল তা কে জানে। একটা উৎসবে দশ বার হাজার লোক প্রসাদ পাবে, কত কি জিনিসের প্রয়োজন, টাকাই বা কোথায়, চাল ডালই বা কোথায় পাওয়া যাবে।

সবাই চিন্তিত কি হবে এবার? এবার কি তা হলে উৎসব হবে না। ভাবছেন সবাই, ভাবছেন ডাক্তার যুধিষ্ঠির সিংহ। উৎসবের কয়েকদিন আগে ডাক্তার সিংহ যেন ঠাকুরের স্বপ্নাদেশ পেলেন—কোন চিন্তা নেই উৎসব হবে।

সত্য সত্যই খুব সুন্দরভাবে উৎসব সম্পন্ন হল। কোথা থেকে এল টাকা, চাল, ডাল, কে জানে। হাজার হাজার মানুষ এল, প্রসাদ পেল।

সবার অলক্ষ্যে যাঁর উৎসব তিনি যেন নিজেই সব কিছুর ব্যবস্থা করে এই মহোৎসব করে দিলেন।

গয়েশপুরের আর এক নিষ্ঠাবান ভক্ত শ্রীঅনিলকুমার বসু। তিনি

তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে নিত্য কীর্তনানন্দে মেতে থাকতেন। অত্যন্ত ভক্তি সহকারে তিনি ঠাকুর সেবা করেন ও প্রতি বছর রাসপূর্ণিমাতে বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজা করেন। তাঁর মুখে একবার শুনলাম যে নারায়ণ পুজোর সময় সব কিছু জোগাড় হয়েছে ও পুজো শুরু হবে। এমন সময় আকাশ কালো করে মেঘ উঠল। সবাই অনিলবাবুকে ত্রিপল নিয়ে আসতে বললেন। কিন্তু তিনি কিছু না করে শুধু ঠাকুরের ছবির সামনে গিয়ে করজোড়ে কি যেন নিবেদন করলেন।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল মেঘ কোথায় উড়ে গিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠে সারা গয়েশপুর আলোয় আলোয় ভরিয়ে দিল।

ওখানে যত ঠাকুর ভক্ত আছেন সবাই গুরুগত প্রাণ। এই নিষ্ঠা ভক্তি দেখে মনে হয় শ্রীশ্রীরামঠাকুর যেন গয়েশপুরের মাটিতে বাধা পড়েছেন।

ধন্য গয়েশপুরের মৃত্তিকা। ধন্য ভক্তবৃন্দ।

একবার ছোট একটা ডিঙি করে কয়েকজন ভক্ত ঠাকুরকে নিয়ে মুনশীগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জে আসার সময় ঝড়-বৃষ্টির কবলে পড়েন। বড় বড় ঢেউ এসে ডিঙিখানাকে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। ঢেউয়ের তোড়ে জল ঢুকে পড়ছে ডিঙির ভেতর। সবাই ভাবছে এ যাত্রায় আর বোধ হয় রক্ষা পাবার আশা নেই। শুধু রামঠাকুর নির্বিকার ভাবে বসে আছেন।

একসময় হঠাৎ তিনি বললেন, 'ঢেউগুলো হরিনাম করতে করতে ডিঙিটাকে গুঁতো মেরে যাচ্ছে।'

সবাই অস্থির। ওদিকে বৃষ্টিরও দাপট তেমনি। ডিঙিটা মাঝে মাঝে এমনি ভাবে চলছে যে এবার বুঝি উল্টে যাবে। ঠাকুর গুন গুন করে ভিতরে বসে গান গাইছেন আর মাঝে মাঝে বলছেন, 'ভয় নেই, একটু বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ডিঙি নৌকাটা তেমনি ভাবে দুলতে দুলতে চলছে। সবার মনে প্রবল আশঙ্কা. নিদারুণ এক উদ্বেগ। এমন দুর্যোগে না বের হলেই ভাল হত। কত কি যেন সবাই ভাবছেন তার শেষ নেই। শুধু একটা জিনিস কেউ ভাবছেন না বা ভুলে গেছেন যে ডিঙিতে ঠাকুর যার কাণ্ডারী হয়ে বসে আছেন সে ডিঙির কোন ক্ষতি হতে পারে না। পার করার মালিক তিনি, অবশ্যই পার করে দেবেন।

পার্থিব জগতের মানুষ আমরা 'কিন্তু'র জলবিন্দু সব সময় টলমল করছে আমাদের জীবন পদ্মপাত্রে। যদিও ভেবে নেওয়া যায় ঠাকুর আছেন ভয় কি? তবুও মনে হয় 'কিন্তু' যদি ডুবে যায়—সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আত্মনিবেদন করতে পারি কই?

ঈশ্বর নির্ভরতা আমাদের থাকলে কি আর এই গতি হত!

স্বয়ং ভগবান আমাদের হাত ধরে নিয়ে গেলেও বিশ্বাস হবে না যে ঠিক পৌঁছে যাব। একেই বলে দ্বিধা। অজ্ঞানতার ভয়।

কেন এমন হয়!

কারণ অজ্ঞানতার কাল অন্ধকারে ঢাকা আমাদের সম্পূর্ণ জীবন। আত্মজ্ঞান থাকলে তবেতো বিশ্বাস জন্মাবে। অজ্ঞানতার সুতিকাগারে বিশ্বাসের অকালমৃত্যু ঘটেছে। তাই আমরা দিশাহারা, দিকহারা। এক একটা পথভোলা বিভ্রান্ত পথিক।

রামঠাকুর হিমালয়ের গহন অরণ্যে নিজের সাধন-ভজন নিয়ে সময় কাটালে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় কোন রকম বাধা-বিপত্তি আসতে পারত না। নিজের জীবনকে ঈশ্বরধ্যানে সব সময় নিমগ্ন করে রাখতে পারতেন। কিন্তু লোকহিতকর কাজের জন্য মন ব্যাকুল হওয়ায় মানুষের কষ্ট দেখে তাদের মাঝে নেমে এসে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। নিজের জন্য সব মহাপুরুষই সাধনা করতে পারেন কিন্তু পরের জন্য সাধন-ভজন করেন কজন।

ঠাকুর যেন সকলের দুঃখকষ্টকে নিজের কাঁধে নিয়ে অপরকে সুখী করতে চেয়েছেন। অপরের রোগব্যাধি নিজে ধারণ করে নিজে কষ্ট পেয়েছেন—তাতেও যেন তাঁর সুখ।

তাই দেখি তিনি হুগলীর এক গ্রামে থাকাকালীন ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বরের তাপে তাঁর সারা শরীরে যেন ফোস্কা পড়ে যায়। ঐ গ্রামেরই এক ডাক্তার তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর চিকিৎসার ভার নিলেন বটে কিন্তু কিছুই হল না। ডাক্তারবাবুর মনে খটকা লাগে। কেন উনি সুস্থ হচ্ছেন না? যেসব ওষুধ তাঁকে দেওয়া হয়েছে তাতে তো সুস্থ হবার কথা। কিন্তু ফল উল্টো হচ্ছে কেন? দেবতার চিকিৎসা করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তিনি নানা চিন্তা করছেন এমন সময় এক ফকির এসে ডাক্তারবাবুর হাতে একটা শিকড় দিয়ে বলে যান ওটা বেঁটে খাইয়ে দিতে।

সত্যসত্যই শিকড়টা বেঁটে খাওয়ানোর পর তিনি সুস্থ হলেন।

ঠাকুর সুস্থ হবার কিছুদিন পর তিনি বাঁশবেড়েতে এক ভদ্রলোকের বাসায় কয়েকদিন ছিলেন। ভদ্রলোকের এক পুত্রের বাতের রোগ ছিল। বাত রোগে পঙ্গু হবার উপক্রম যখন, তখন ভদ্রলোক ঠাকুরকে ধরে বললেন, আমার আর আপনি ছাড়া কেউ নেই। আপনি যদি এর ব্যবস্থা করেন তাহলে ও চলাফেরা করতে পারবে আর নইলে ও চির-কালের মত পঙ্গু হয়ে যাবে।

ঠাকুর অবশেষে বললেন, 'আচ্ছা দেখা যাবে।'

তারপর একদিন হঠাৎ তিনি ধ্যানস্থ হলেন। ছেলেটির বাতরোগ তিনি ধীরে ধীরে নিজের দেহে টেনে নিয়ে ছেলেটিকে সুস্থ করলেন। লাভের মধ্যে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় হাঁটাচলা করতে পেরেছেন বটে কিন্তু বাতরোগ আর সারে নি। মাঝে মাঝেই বাতরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শয্যাশায়ী হতেন।

প্রেমময় ঠাকুর সারা জীবনে যতটা সাধনায় কাটিয়েছেন তার চেয়ে ঢের বেশি সময় কাটিয়েছেন পরহিতৈষণায়।

সর্বজগতই যেন তাঁর বাসস্থান, জগতের সব মানুষই যেন তাঁর আপনজন। কে ছোট, কে বড়, কে মূর্খ, কে জ্ঞানী এ সব কোনদিনই তিনি দেখেন নি। সবাই এক ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত। স্রষ্টা যদি একজনই হয় তাহলে তাঁর সৃষ্ট সবই তো এক সূত্রে বাঁধা।

তিনি তাঁর নিজের জীবনের কর্ম দিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে গেছেন— মানুষকে ভালবাস। মানুষের সুখদুঃখে হাসো কাঁদো, পরের বিপদকে নিজের বিপদ বলে মনে কর। এই তো সাধনা, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভেই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সব মিলবে। মন্দিরে মসজিদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানস্থ হয়ে থাকতে হবে না। চোখ মেলে দেখলে দেখা যাবে এক ঈশ্বর হাজার ঈশ্বর হয়ে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এই সাধনাই পরম সাধনা। ভগবদ সাধনা এরই নাম। এর জন্য কারও কাছে দীক্ষিত হতে হবে না। কারও কাছে শিক্ষাও নিতে হবে না। জীবসেবার মাঝে জীবত্রাতা কখন কোন সময় চুপিসারে দীক্ষা দিয়ে যাবেন টেরও পাবে না।

জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম।

চাঁদপুরে রোহিণীকুমার মজুমদারের বাসায় ঠাকুর একবার ভয়ানক রক্ত আমাশায় আক্রান্ত হলেন। সমানে সারা দিনরাত রক্ত পায়খানা হতে থাকে। স্থানীয় ডাক্তার নানা রকম ওষুধ দেওয়াতেও কোন ফল হল না দেখে কলকাতায় নামকরা ডাক্তার ঠাকুর আশ্রিত যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্তকে টেলিগ্রাফ করা হল।

তিনি টেলিগ্রাম পেয়ে চলে এসে রোগীর অবস্থা দেখে কলকাতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। দেরী না করে ঠাকুরকে কলকাতায় আনা হল। সঙ্গে আছেন রাজেন বাড়ুয্যে ও উপেন মুখার্জী।

বালিগঞ্জে রামনিবাস ডাঃ দাশগুপ্তের নিজস্ব বাসভবন। দোতলার একটা ঘরে ঠাকুরের থাকার ব্যবস্থা হল। কলকাতায় আসার পর চিকিৎসার ফলে রোগের কিছুটা উপশম দেখা দিল বটে কিন্তু যন্ত্রণার কোন হেরফের ঘটল না।

একদিন সাতসকালে ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে ঠাকুর অনুরোধ করলেন এক গ্লাস কাঁচা দুধ দিতে। তিনি তো চমকে গেলেন। এইরকম রক্ত আমাশায় কাঁচা দুধ কিভাবে দেবেন। ঠাকুর আবার বললেন, কাঁচা দুধ দেবার জন্য। অগত্যা ডাক্তারবাবুর স্ত্রী স্বামীকে টেলিফোন করে জেনে নিলেন কাঁচা দুধ দেওয়া যাবে কি না। শেষে ডাক্তারবাবু অনুমতি দিলেন।

তিনি এক গ্লাস কাঁচা দুধ এনে দেওয়াতে ঠাকুর এক চুমুকে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে সবটুকু নিঃশেষ করে বললেন, 'বাঁচলাম, রক্ত আমাশা অনেকটা কমল এবার।'

পরদিন ঠাকুর বেডপ্যানে মলত্যাগ করলে দেখা গেল মল স্বাভাবিক হয়েছে।

ডাক্তারবাবু শুধু বললেন, কি রকম হল? এ কদিন ধরে তিনি তাহলে কার চিকিৎসা করলেন।

অবিনাশচন্দ্র নাম নিয়ে মহানন্দে আছেন।

রাতে শুয়ে হঠাৎ তার চিন্তা হল তিনি যদি দিনে রাতে কোন কারণে নাম না করতে পারেন তাহলে তো গুরুই তার হয়ে নাম করবেন। কিন্তু গুরুর অবর্তমানে কি হবে! এই চিন্তা তার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। তিনি ঘুমুতে পারলেন না। সকাল হতেই ছুটলেন তিনি ঠাকুরের কাছে। সত্যই বড় কঠিন সমস্যা, গুরুর অবর্তমানে কি হবে?

ঠাকুর যেন তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

তিনি প্রণাম করতেই বলে উঠলেন, 'গুরুর কোনদিন মৃত্যু হয় না। তিনি মৃত্যুহীন।'

অবিনাশ অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। তিনি যে সারারাত এ বিষয়ে চিন্তা করেছেন তা ঠাকুর কি করে জানলেন?

অন্তর্যামী গুরু চিরদিনই ভক্তের হৃদয় বৃন্দাবনে এমনি ভাবেই ঘুরে বেড়ান।

অবিনাশবাবু তখন চাকরীতে আছেন। কুলাউড়া স্টেশনের কাছেই তাঁর রেল কোয়ার্টার। কোয়ার্টারের সংলগ্ন বাগানে তিনি অজস্র বেল-ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন। বহু জায়গা থেকে দিনের পর দিন এই গাছগুলো সংগ্রহ করেছেন। নিয়মিত পরিচর্যাও তিনি করে থাকেন। অথচ দুঃখের বিষয়, গাছগুলো ঝাড়ে-বংশে বৃদ্ধি হলেও কেউই একটা ফুল দিল না। এই বন্ধ্যা গাছগুলো নিয়ে তিনি খুবই চিন্তায় ছিলেন।

ঠাকুর সেই সময় আসাম পরিক্রমা করছেন। অবিনাশবাবু সংবাদ পেলেন যে ঠাকুর কয়েকদিনের জন্য তাঁর কোয়ার্টারে আসবেন। দু একদিনের মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন। সংবাদ পেয়েই তিনি টুকি-টাকি কাজ সেরে ঠাকুর সম্বর্ধনার জন্য তৈরি হলেন। গুরুদেব আসছেন। আনন্দে তাঁর মনপ্রাণ ভরপুর।

ঠাকুর আসার আগেরদিন তিনি ফুলের চিন্তায় পাগল হলেন, ফুল পাওয়া যাবে কোথায়? গাছগুলোর পিছনে যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হয়েছে তা সব বৃথা হয়ে যাবে। ঐ ফুল যদি আর নাই ফোটে তাহলে তিনি সব গাছ তুলে ফেলবেন।

এর নামই বুঝি অদৃষ্ট। গাছ লাগালে তাতে ফুল ফুটবে না। গরু পুষলে দুধ দেবে না। এসবের জন্যও অদৃষ্ট দরকার। তিনি সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাত পোহাল। সূর্য তখনও ওঠে নি। অবিনাশবাবু কি ভেবে বাগানে গিয়ে জয়রাম জয়রাম বলে চীৎকার করে উঠলেন। তিনি

বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখলেন সবকটি বেলফুল গাছে ফুল ফুটেছে। সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। কখন বা কুঁড়ি দেখা দিল কখন ফুল হয়ে ফুটল তা কে জানে। সবই সেই অন্তর্যামী গুরুরূপী ভগবানের কৃপা ছাড়া এ কি করে সম্ভব।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন :

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥"

যে যেভাবে তাঁকে ভজনা করে তিনিও সেই ভাবে তাকে অনুগ্রহ করেন।

বিশ্বাস থাকলে বন্ধ্যা গাছেও ফুল ফোটে।

"বিশ্বাসেতে সকল মিলে
জ্ঞানের পথও দেয় যে খুলে॥
বিশ্বাসেতেই আসেন তিনি ধেয়ে।
আমি নহি তিনি কর্তা এই বোলে থাকো।
আমি করি ধারণাটি কভু কোর নাকো।"

নোয়াখালির শুভময় দত্তের বাসায় সেবার ঠাকুরের জন্মোৎসবে গেছেন অবিনাশবাবু। ঠাকুর সে সময় নোয়াখালিতে নেই। শুভময়-বাবুর সঙ্গে তাঁর সেরকম আলাপ পরিচয়ও ছিল না। তাঁর এক ভাইয়ের সঙ্গে হৃদ্যতা থাকায় সেই সুবাদে তিনি উৎসবে এসেছেন।

বাক্স-বিছানা তিনি এক আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে গেলেন। যাবার সময় সেই আত্মীয় ভদ্রলোক তাঁকে বললেন, 'আসবার সময় প্রসাদ খেয়ে আসবেন আমি আর আপনার জন্য রাতে কোন ব্যবস্থা করব না।'

অবিনাশবাবু চলে গেলেন। জন্মোৎসবে লোক ধরে না। নামকীর্তন

চলছে অবিরাম। অনবরত মানুষের আনাগোনা। তিনিও কীর্তনে যোগদান করে কীর্তনানন্দে মেতে উঠলেন। কোন বিরক্তি নেই, কোন অস্বস্তি নেই। কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি নাম করে চলেছেন। রাত তখন দশটা কি সাড়ে দশটা হবে। সংকীর্তন শেষে প্রসাদের জন্য ডাক পড়ল। তিনি দলের সঙ্গে মিশে গিয়ে স্থান না পাওয়ায় ফিরে এলেন। বার বার চেষ্টা করে তিনি আর জায়গা না পাওয়ায় কেমন এক অভিমান নিয়ে সোজা আত্মীয়ের বাসায় ফিরে এসে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে মিষ্টি মধুর নাম কানে যেতেই তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে সংকীর্তনের সঙ্গে চলতে লাগলেন। নগরকীর্তনে আশপাশের মানুষও এসে যোগ দিলেন। এক জায়গায় কারা যেন নকুলদানা ছিটিয়ে দিলেন। পায়ের ধুলোয় কত পড়েছে, কত লোকের মাথায় পড়ছে, সবাই পাখির মত পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে মাথায় ঠেকিয়ে মুখে দিচ্ছেন। অবিনাশবাবু আর সে চেষ্টা করলেন না। দল এগিয়ে চলেছে কীর্তন করতে করতে।

এমন সময় কে যেন হঠাৎ এসে অবিনাশবাবুর মুখের মধ্যে বড় একটা নকুলদানা পুরে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাশের একজন বলে উঠলেন, 'ঠাকুর যে আপনাকে নকুলদানা খাইয়ে গেলেন, দেখেছেন ?'

অবিনাশবাবু বললেন, ঠাকুর কই ?'

পাশের লোকটি আবার জবাব দিলেন, 'ঐতো চলে যাচ্ছেন।'

অবিনাশবাবুর মুখে তখনও নকুলদানা মিলিয়ে যায় নি। তিনি দেখতে পেলেন যে ঠাকুর কীর্তনের এক পাশ দিয়ে খুব ব্যস্ত ভাবে চলে যাচ্ছেন। আর কি তিনি ধরতে পারেন। চকিতে ঠাকুর যে কোথায় মিলিয়ে গেলেন তা কে জানে।

পরবর্তীকালে কথাচ্ছলে ঠাকুর একদিন অবিনাশবাবুকে বলেছিলেন, 'প্রসাদ কোনদিন কেউ খেতে পারে না প্রসাদ পেতে হয়।'

'তাই বুঝি ঠিক! প্রসাদও সবার ভাগ্যে মেলে না।' নোয়াখালির উৎসবে তিনবার চেষ্টা করেও তিনি প্রসাদ পান নি।

ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী একবার কঠিন অসুখে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হন। গ্রামের ডাক্তার রোগের কোন উপশম করতে পারলেন না দেখে কালীঘাটের ঠিকানায় ঠাকুরকে পত্র দেওয়া হল। ভাগ্যক্রমে ঠাকুর সেখানে থাকায় পত্র পেয়েই চলে এলেন।

বাড়ি এসেই তিনি বললেন, 'এসব সামান্য অসুখ-বিসুখ তো হরিনামেই সেরে যায়।' হরিনামামৃতসুধাতেই সুরেন্দ্রমোহন সে যাত্রা ভাল হয়ে গেলেন।

সতীন্দ্রমোহন চক্রবর্তীও সংবাদ পেয়ে মৈমনসিং থেকে চলে এলেন, বাড়িতে। এসে কদিন থাকার পর মৈমনসিং ফিরে যাবার সময় ঠাকুরের পা আঁকড়ে ধরে বললেন, তাঁকে বিয়ে করে সংসার পাততে হবে। ঠাকুর নানান কথা বলছেন, সতীন্দ্রমোহনও ছাড়বার পাত্র নয়। কথা না পেলে তিনিও পা ছাড়বেন না।

অবশেষে তিনি সম্মতি জানিয়ে বললেন, পাত্রীর সন্ধান কাউকে করতে হবে না। কলকাতায় কৃষ্ণবাবু নামে এক ভদ্রলোক ঠাকুরকে তার এক কন্যা দান করার কথা জানিয়েছেন। ঠাকুরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিয়ে যদি একান্তই করেন তবে তার কন্যাকেই গ্রহণ করবেন।

ডিঙামানিক থেকে পত্র গেল কলকাতায় কৃষ্ণবাবুর কাছে। কোন জবাব এল না। বেশ কিছুদিন পর সিমলা থেকে এক পত্র এল তাতে কৃষ্ণবাবু জানিয়েছেন যে ঠাকুর তাঁর কন্যাকে গ্রহণ করবেন এতে তাঁর বংশ পবিত্র হবে। এতখানি ভাগ্য তাঁর হবে একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। বিয়ে কলকাতায় হবে। বিয়ের তারিখ ঠিক করে পরে তিনি জানাচ্ছেন।

বাড়িতে সবাই ভাবছে কি আনন্দ হবে। কি কি করতে হবে মনে মনে সবাই সেই ছক্ তৈরি করতে লাগলেন।

কিন্তু পাত্র কোথায়? রামঠাকুর যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন কে জানে। সুতরাং বিয়ে আর হল কৈ!

অনেকদিন পর ঠাকুর একদিন গল্পচ্ছলে বলেছিলেন, যে মেয়েটি খুব ভাল। ধর্মকর্ম মানে। দেবদ্বিজে খুব ভক্তি। বিয়ে যদি কলকাতায় হয়, তাহলে গ্রামের সবাই বরযাত্রী যাবে। কৃষ্ণবাবু খুব বড়লোক। সবাইকে বেশ ফিটফাট হয়ে যেতে হবে। বাড়ি ঘর সাজাতে হবে। যে ঘরে বৌ উঠবে সে ঘর সব চেয়ে ভাল করে সাজাতে হবে। আলপনা দিতে হবে—নতুন বৌ যাতে খুশি হয়—সেই দিকে নজর রাখতে হবে।

একবার একটু হেসে ফেললেন রামঠাকুর, 'একটা কলেরগান আনতে হবে, কলকাতার মেয়ে, গানবাজনা না থাকলে চলবে কেন।'

সেদিন ঠাকুরের কথা কেউ বুঝতে না পেরে আকাশকুসুম কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সামান্য মক্ষিকা কি হস্তীর সব খবর আনতে পারে!

তিনি যে কোন বাঁধনেই বাঁধা পড়তে চান নি। তাঁকে বাঁধে এমন শক্তি কার আছে। এই আছে, এই নেই যাঁর মনের গতি, তাঁকে বাঁধতে পারে এমন রজ্জু কোথায় মিলবে!

ঠাকুর যে মুক্ত বিহঙ্গ। তাঁর কি কোন বাসস্থান আছে। ভালবাসাতে যিনি অবিরাম বাস করছেন তাঁর আবার জাগতিক বন্ধন কি?

সে ভালবাসা কি?

ঈশ্বর নিকেতন।

সেই নিকেতনে ঘর যে একবার বাঁধতে পেরেছে তার আর অন্য ঘরের কি প্রয়োজন আছে।

এই ঘরে আশ্রয় পাবার জন্য যুগে যুগে মুনিঋষি সাধক মহাপুরুষ সাধনা করেছেন। আশ্রয় যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আর ঘরের বার

হন নি। সে ঘরে যে সঙ্গী পেয়েছেন তা ছেড়ে আর কেউ বাইরে আসে?

সেই চৈতন্যময় ভগবান।

বরিশালের বিশাল মানুষ অশ্বিনীকুমার দত্ত সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন, পূর্ব জন্মে অশ্বিনীকুমার ছিলেন হিমালয় প্রবাসী সাধক। দেহ ছিল তার বরফের মতো সাদা। কিন্তু দেশ সেবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর প্রবল, তাই দেশের জন্য যা তিনি করে গেলেন তা দেশবাসী কোনদিন ভুলতে পারবে না।

একদিন ভ্রাতুষ্পুত্র সতীশবাবুকে ঠাকুর বললেন, 'কিছু মাংস যোগাড় করে আনতে পারিস?'

সতীশবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'মাংস কে খাবে?' ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁরে মাংস একজন খেতে চেয়েছেন।'

অগত্যা সতীশবাবুকে কিছু মাংস যোগাড় করতে হল।

মাংস আনা হলে ঠাকুর কলাপাতায় তা বেঁধে ছাদে রেখে এলেন। কিছুক্ষণ পর একটা বাজপাখি এসে ছোঁ মেরে সেই মাংস নিয়ে গেলে সতীশবাবু বললেন, 'মাংস যে বাজপাখি নিয়ে গেল।'

ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ উনিই তো মাংস খেতে চেয়েছিলেন।'

ঠাকুরের কিছু মুসলমান ভক্ত ছিলেন।

তার মধ্যে গুরু প্রেমে মাতোয়ারা চেরাগ আলী নামে এক মুসলমান ভক্ত ছিলেন। তিনি জাতিতে জোলা। কাপড় বুনে তিনি কোন রকমে সংসার চালাতেন।

কাপড়ই শুধু তিনি বুনতেন না। ভক্তির সুতো দিয়ে হৃদয় মনের ছিদ্র সেলাই করতেন।

ভক্তি না থাকলে ভক্ত হওয়া যায় না এ বোধ তাঁর কাপড় বুনতে বুনতেই হয়েছিল। ঠাকুরের প্রতিও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

ঠাকুরকে দর্শন প্রণামের জন্য তাঁর মন সব সময় আকুলি-বিকুলি করত। একদিন তিনি ঠাকুর দর্শন মানষে ঠাকুরের বাড়ির কাছে এক পুকুর পাড়ে বসে আছেন। ঠাকুর তাঁকে ডেকে নিয়ে কাছে বসালেন।

জাতিতে মুসলমান বলে ঠাকুরের কাছে আসতে তিনি ইতস্ততঃ করেছিলেন।

ঠাকুর তাঁকে সাদরে হাত ধরে কাছে বসিয়ে বললেন, 'স্বপ্নে যে মন্ত্র আপনি পেয়েছেন তাই জপ করবেন। সম্পর্কে আপনি যে আমার তালই হন, আপনি তো আমার অনেকদিনের চেনা।'

চেরাগ আলী সবাইকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বললেন, 'ঠাকুর আমাকে কৃপা করেছেন।'

ঠাকুর আবার বাতের ব্যথায় আক্রান্ত হলেন। স্বর্ণখোলা থেকে কামিনী মজুমদার পাল্কী নিয়ে তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছেন। ঠাকুর চললেন। সেই গ্রামে হিন্দু মুসলমান সবাই ঠাকুরকে দেখার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

ঠাকুর হিন্দু সুতরাং হিন্দুদেরই যেন অগ্রাধিকার। তারা ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য সবার আগে আসতে চায়।

মুসলমানদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, 'ঠাকুর কি শুধু হিন্দুর আমাদের নয়?'

অতঃপর ঠাকুর সবাইকে দর্শন দিলেন।

তিনি হিন্দু মুসলমান সবারই। তিনি কোনদিন কাউকে ছোট বড় মনে করেন নি। পরমেশ্বর যে সবারই পিতা।

তাবিজ-কবচ, কাপড়-লুঙী, মন্দির-মসজিদ, আল্লা-ভগবান সব খিচুড়ি না বানালে ভগবানের মাহাত্ম্য বোঝা যায় না।

চেরাগ আলী সাধু!

সদানন্দময় ভগবানের সেবক যিনি তিনি সাধু ছাড়া আর কি।

ঠাকুর ভক্তরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি যেখানেই উৎসব

হত সেখানেই যেতেন। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও তিনি ভক্তিধনে ধনী ছিলেন।

প্রতি বছরই তিনি তাঁর জীর্ণ কুটিরে নামকীর্তন, সত্যনারায়ণ পূজা ও ঠাকুরের উৎসব করতেন। সে উৎসবে সকল সম্প্রদায়ের লোকই যোগ দিতেন। সংকীর্তনের যে কি আনন্দ তা কথায় বোঝানো যাবে না।

মহাপ্রভু বলেছেন :

"তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন।
যাহা হইতে মিলে ব্রজে কৃষ্ণ প্রেমধন॥"

চেরাগ আলী কুটিরে ঠাকুর ভক্তরা একদিন কীর্তনে মেতেছেন। এমন সময় এক মৌলানা সাহেব কীর্তন আসরে এলেন। সবাই তাঁকে সম্ভ্রমে বসালেন। তিনি মনসংযোগ করে কীর্তন উপভোগ করার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হরিনাম কীর্তন শ্রবণে তিনি কি ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করলেন!

মৌলানা সাহেব পরমানন্দে জবাব দিলেন, 'আপনাদের কীর্তনে আমি কিন্তু আল্লার নাম, গুণগানই শুনেছি। আহা কি মধুর। আমার কানে যেন এখনও লেগে আছে।

হরি ও আল্লা। আল্লা ও হরি। টাকার এপিঠ আর ওপিঠ।

দুই এক হয়ে বাজারে জিনিস ক্রয় করে। হিসাব করে খরচ করলে সব কিছু কেনাবেচা করতে জানা যায়।

চেরাগ আলী ঠাকুরের একটা ফটো নিয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে থাকতেন। ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজা করতেন একনিষ্ঠ ভাবে। দুরন্ত পদ্মার ভাঙনে চেরাগ আলীর বাড়ির কিয়দংশ ভেঙে নিলেও ঠাকুরের মূর্তি যে ঘরে ছিল সে ঘরের কিছুই হয় নি।

কিছুদিন পর সাধু চেরাগ আলী হঠাৎ রক্তবমি করে দেহত্যাগ করলেন। তাঁর ছোট ভাই সে ঘর ও ঠাকুরের ফটো নাকি এখনও আঁকড়ে ধরে পড়ে আছেন।

চেরাগ আলী আজ নেই।

হয়ত ঠাকুরের প্রয়াত ভক্তদের মাঝে গিয়ে ঠাকুর সান্নিধ্যে মহা-শান্তিতে আছেন।

ঠাকুর আজ চোখের আড়ালে চলে গেছেন। কিন্তু মনের আড়াল হতে পারেন নি! দিকে দিকে তাঁর চরণধ্বনি আজও শোনা যায়।

তিনি আজ নেই। আমরা আছি। একথা ভাবতে পারি না।

তিনি চির ভাস্বর, চির জাগ্রত, তাঁর প্রবেশ আছে প্রস্থান নেই। আগমন আছে নির্গম নেই।

তিনি আছেন। আমরা বরং নেই। আমরা যে সবাই তাঁর মাঝে আশ্রয় নিয়েছি।

আমাদের যত সুখ-দুঃখ তাঁর মাঝে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত আছি। কি পাব কি হারাব তা আমরা জানি না।

শুধু এইটুকু জানি যে আর্তের ভগবান আর্তকে রক্ষা করার জন্য চার হাত পা বাড়িয়ে আছেন।

গীতায় ভগবান বলেছেন :

"যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে"॥

অর্থাৎ সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে মৎ পরায়ণ হয়ে যারা আমার ধ্যান ও উপাসনা করে তাদের আমি অবশ্যই রক্ষা করি।

দয়াল ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্র সবার মাঝে যেন মিছরির টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন, তাই সে মিছরির আস্বাদ উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র শুচি-অশুচি-সবাই আস্বাদন করেছিলেন।

সে রস কি! ভক্তি রস প্রেম রস।

ভক্তি মিশ্রিত প্রেমের নিগড়ে যাকে বাঁধা যায় তিনিই ভগবান। "ভক্তিরসঃ পুরুষোভক্তিরেব ভূয়দীতি"।

তিনি ভক্তিরই বশ আর ভক্তি ছাড়া তো ভগবদ প্রাপ্তি হয় না।

ঠাকুর তখন ফেনী কলেজের অধ্যাপক প্রমথনাথ চক্রবর্তীর বাসায় রয়েছেন। ঠাকুরের আগমনে চারিদিক থেকে জনস্রোত বয়ে আসে। সবার জন্যই দ্বার খোলা। দ্বারে কোন দ্বারী নেই।

প্রেমের হাটে, প্রেমের ঠাকুর বসে আছেন, দেখে যাও প্রাণ ভরে।

দেবেন্দ্রনাথ ভুঁইমালী একজন অস্পৃশ্য। সে নিজেকে নীচ মনে করে এক পাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য মানুষের দেহে যেন ছোঁয়া না লাগে এমনি ভাবে বারে বারে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে।

কি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি.

মানুষের মাঝে মানুষ হয়ে কর্মফল দোষে অস্পৃশ্য।

ঠাকুর তাঁর এই দুঃসহ অবস্থা দেখে তাকে কাছে ডেকে বললেন, 'তোমার বাড়িতে আমি যাব।'

উপস্থিত সবাই তো অবাক।

সে কি! শহরে এত বাড়ি থাকতে ঠাকুর যাবেন এক অস্পৃশ্য ভুঁইমালীর বাড়ি!

মহামানব যাঁরা, তাঁরা সর্ব যুগে, সর্ব কালে, এদের বাড়ি গিয়ে এদের কোলে টেনে নেন। এদের বুকে ধরেন, মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব এমনি ভাবে নীচকে কোল দিয়েছিলেন।

দেবেন্দ্র চমকে উঠেছে—ঠাকুরের একি আচরণ। সে যে অতি হীন জাতি। তার তো কিছুই নেই। কি দিয়ে তাঁর সেবা করবে। তার কুঁড়েঘরে কি ভাবে ঠাকুর পায়ের ধুলো দেবেন।

ঠাকুর একদিন তাঁর ভক্তদের নিয়ে ট্রেনে উঠে দেবেন্দ্রর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। গন্তব্যস্থানে নেমে ঠাকুর চললেন তার জীর্ণ কুটিরে। তাঁদের চলার পথে কত লোক যে সহযাত্রী হলেন তার হিসাব নেই। সবাই দেখতে চান দীনের কুটিরে কেমন করে ঠাকুরের পদধূলি পড়ে।

দেবেন্দ্র দরিদ্র। মাটির বাড়ি, না আছে আদর আপ্যায়ন করার দ্রব্য সামগ্রী। না আছে সেবা পূজার কিছু।

পর্ণকুটিরে ঠাকুর দেবেন্দ্রর সেই ছেঁড়া কাঁথার উপরেই সবাইকে নিয়ে বসলেন। উৎসবের আয়োজন হল, পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা বাকি থাকল না। শুরু হল নামকীর্তন, দেবেন্দ্রর বাড়ি পরিণত হল ভগবানের লীলা নিকেতনে।

এ দৃশ্য যারা দেখেন নি তাদের মন্দভাগ্য। দেবেন্দ্রর প্রাঙ্গণে কীর্তনানন্দে বিভোর উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র। কারও জাত গেল না।

জাত যায় বজ্জাতের।

কীর্তন শেষে দেবেন্দ্রর বাড়িতে সবাই এক সাথে বসে প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

ভাগ্যবান দেবেন্দ্র ভূঁইমালী।

দেহমনের শূন্য জায়গাটা পূর্ণ হয়ে গেল ঠাকুরের আশীর্বাদে।

এর নাম তো কাঙালের ঠাকুর।

এর নামই পতিতের ভগবান।

চৌমুহানীর আশ্রম ঝাড়ু দিত রামচন্দ্র মালী। তার বাড়ি ছিল নোয়াখালির উত্তর হাতিয়া গ্রামে। ঠাকুর তার বাড়িতেও পায়ের ধুলো দিয়ে তাকে ধন্য করেছেন।

আর একজন ছিলেন ঠাকুরভক্ত পরম ভক্তিমতী কৃষ্ণমালা। সত্য সত্যই তিনি কৃষ্ণকে মালা করে কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। তার বাড়ি ছিল কুমিল্লার কাছে উনাইসার গ্রামে। ঠাকুর তার বাড়িতেও গেছেন। মহানন্দে নাম গান করেছেন। কৃষ্ণমালার স্বামীও অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ ছিলেন।

ঠাকুরের উৎসব যেখানেই হত, সেখানেই যোগ দেওয়া ছিল এই যুগল ভক্তের প্রধান কাজ।

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের পরিব্রাজক জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে তিনি দিনের পর দিন পথ পরিক্রমণ করে গেছেন। সারা জীবন

কৃত পথ যে পরিক্রমা করেছেন তার হিসাব কে করবে। তাঁর চলমান জীবনের দিনপঞ্জী অনুধাবন করলে বেশ বোঝা যায় যে তিনি বিশ্রাম অতি অল্পই নিয়েছেন।

শ্রান্তক্লান্ত না হয়ে তো মানুষ বিশ্রাম নেয় না। এই ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন মানুষটির পায়ের ছাপ পড়ে নি বাংলাদেশে এমন জায়গা হয়ত খুব কমই আছে।

রামঠাকুর এসেছেন ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক প্রতুল গুপ্তর বাসায়। বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে।

হঠাৎ ঠাকুর বললেন, 'আমার যে রাহুর দশা চলছে। একজন চণ্ডালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। এ কাজ যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই আমার পক্ষে মঙ্গল।'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। চণ্ডাল পাওয়া যাবে কোথায় ? কে চণ্ডাল তাই বা কি করে জানা যাবে।

ঠাকুর তাদের মনের ভাব বুঝতে পারলেন।

বললেন, 'উয়ারীর রাস্তা ধরে কিছুদূরে গেলেই তাকে পাওয়া যাবে।'

দুতিন জন ছুটলেন চণ্ডালের খোঁজে। ঠাকুরের নির্দেশিত পথ ধরে গিয়ে দেখলেন একটা লোক রাস্তায় নানা কাজে ব্যস্ত। ওরা কাছে গিয়ে জানলেন লোকটা চণ্ডাল।

ঠাকুর ডেকেছেন শুনে আনন্দে সে ঠাকুর সন্দর্শনে এল। তিনি তাকে তাঁর বাড়ির সবাইকে নিয়ে আসতে বলে সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন।

সংসারে ঐ লোকটির ছেলে, ছেলের বৌ আর এক নাতি ছাড়া কেউ ছিল না। স্ত্রী কিছুদিন আগে মারা গেছে। সে তাদের সবাইকে সাথে করে প্রতুলবাবুর বাসায় এসে উপস্থিত হল।

লোকটি অতি দরিদ্র হলেও ঠাকুরের জন্য একটা নতুন বস্ত্র এনেছিল। নামকীর্তন শুরু হল। এর মাঝেই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানও চলল। ঠাকুর তাকেও একটা নতুন বস্ত্র দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে মিত্রতা স্থাপন করলেন। মালাচন্দন দিলেন। তার গলায় দুলতে লাগল ঠাকুর প্রদত্ত ফুলের মালা।

ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়ে তার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। আবার একালেও দেখা গেল রামঠাকুর চণ্ডালের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। জানি না সে রাম আর এ রামে তফাৎ কোথায়!

ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন, বার বার আসছি আর একই নাম ধরছি। জানি না এ কথার অর্থ কি?

ঠাকুর কলকাতার আর্ল স্ট্রীটে ৺কুঞ্জলাল মজুমদারের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। তিনি সেখানে অনেকদিন ছিলেন। ঠাকুরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল ওপরের একটা ঘর।

কুঞ্জবাবু ও তাঁর স্ত্রী ঠাকুরের সেবাযত্ন করে তাঁর কৃপালাভ করেছিলেন। প্রতি বৎসর সেই বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজা, পাঁচালী পাঠ ও নামকীর্তন হত। বহু ভক্ত তাতে যোগ দিতেন।

এই কুঞ্জবাবুর বাসায় একদিন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। ঠাকুর তখন অন্যত্র চলে গেছেন। হঠাৎ একদিন তিনি এসে কোথা থেকে কুঞ্জবাবুর স্ত্রীকে বললেন, 'এখনই সত্যনারায়ণ পূজা হবে। সব ব্যবস্থা করে দিন।'

কুঞ্জবাবুর স্ত্রী অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি, নারায়ণ কোথায়? কোন কিছুর আয়োজন নেই কি ভাবে পূজা হবে?'

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যখন তখন পূজা হবেই।

তিনি বললেন, 'কেন আপনাদের ঐ কুঁজোর ওপরই তো নারায়ণ বসে আছেন—পুজোর ব্যবস্থা করুন।'

এই কথা বলে তিনি সোজা গিয়ে কুঁজোর ওপর বসে ধ্যানস্থ

হয়ে গেলেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আয়োজন করে জীবন্ত নারায়ণের পূজা হল।

এ পুজো যাঁরা দেখেছেন তাঁদের জীবন ধন্য হয়েছে।

শোনা যায় যে, সেই কুঁজো সোনা বাঁধানো অবস্থায় আজও বিদ্যমান।

বর্তমানে ঠাকুরের ভক্তশিষ্য কয়েক লক্ষ হবে বোধ হয়। অথচ পঞ্চাশ বছর আগে এক ঢাকা শহরেই দশ বার জনের বেশি ভক্ত শিষ্য ছিল না। ঠাকুর কোনদিন প্রচার চান নি। তাই সে সময় তাঁর কথা বেশি লোকের কর্ণগোচর হয় নি। ধীরে ধীরে শিষ্যের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কতদিন কতজনকে বলেছেন, 'আমারই দীক্ষা হয় নি তা তোমাদের কি করে দীক্ষা দেব। নাম না পেলে বিলাব কি ভাবে।'

আবার কতজনকে বলেছেন, 'এখনও সময় হয় নি। সময় হলে হবে।' কাউকে বলেছেন, 'আপনাকে আর কি মন্ত্র দেব, সময় হলেই ঠিক মন্ত্র পেয়ে যাবেন।'

সেই ভক্ত হয়ত স্বপ্নেই নাম পেয়ে গেলেন।

ঠাকুর বললেন, 'কেমন পেয়েছেন তো?'

এই কথা বলেই স্বপ্নের মন্ত্র বলে গেলেন, ব্যাখ্যা করে মন্ত্রের মানে বুঝিয়ে দিলেন।

ঠাকুর যে কোন্ পন্থী ছিলেন তা আজও কেউ নির্ণয় করতে পারেন নি। তিনি কাউকে শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। কাউকে বৈষ্ণব মন্ত্র দিয়েছেন। আবার কাউকে বা প্রণব মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। তিনি কোন পন্থী ছিলেন না বা তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নন। তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি মানব সম্প্রদায়ের।

এ ধরনের নিরহঙ্কারী, বিনয়ী, দরিদ্রগতপ্রাণ, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু গুরু কোথায় মিলবে!

মন্ত্র নিয়ে দীক্ষিত হয়ে সবাই সব সময় ফল লাভ করে না। দীক্ষিত হলেই সে তার জীবনের সব দিক আলোকময় হবে এ ধারণা করাও ভুল।

সংসারী মানুষের পদে পদে ত্রুটি ঘটে।

কারও কারও বিশ্বাসের ঘরে অবিশ্বাস উঁকি মারে।

তার এক মাত্র কারণ গুরুর দেওয়া মন্ত্র সবাই কার্যকর করতে পারে না। গুরু তো বীজ বপন করলেন কিন্তু ক্ষেত্র যদি অনুর্বর হয় তাহলে ফসল ফলবে কি করে? সে বীজ তো অকালেই নষ্ট হয়ে যাবে।

ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আগে প্রয়োজন।

তা না হলে বীজ বুনে ফসল পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র।

নামে নিষ্ঠা ও বিশ্বাস যার শেকড়ের মত সারা দেহে ছড়িয়ে যায় সেই ফসল ঘরে তুলতে পারে।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যুগে কত কি আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে। একস্‌-রে যন্ত্র মানুষের দেহের ভেতরের সব কিছুর ছবি তুলে ধরছে।

কিন্তু ঠাকুর মানুষের মনের কথা কিভাবে হুবহু বলে দিতেন তা দেখলে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়।

মৃত আত্মা কোথায় কিভাবে আছে এ সম্বন্ধে বহুজনের বহু প্রশ্নের উত্তর তিনি সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন।

কাউকে বলেছেন, 'তোমার মা তো কালীঘাটে আছেন। তোমার বাবাও বেশ ভাল আছেন।'

একবার একজন যুবক তার প্রাণপ্রতিম স্ত্রীকে হারিয়ে পাগলের মত হয়ে ঠাকুর সান্নিধ্যে এসে জানতে চাইলেন, তার স্ত্রীর বর্তমান অবস্থানের কথা।

ঠাকুর বললেন, 'আপনার স্ত্রী বড় শান্তিতে আছেন—দোহাই

আপনি আর বিয়ে করে তাকে কষ্ট দেবেন না। জন্ম মৃত্যু বিয়ে একবারই হয়।'

ঠাকুরকে একই সময় দুই জায়গায় দেখা গেছে এমন ঘটনা বহু ঘটেছে।

একবার একজন এসে বললেন, 'ঠাকুরকে দেখে এলাম ঢাকার মালিটোলায়।'

আর একজন বললেন, 'তা কি করে সম্ভব, তিনি তো ময়মনসিং শহরে সতীনবাবুর বাসায় গেছেন।'

এ বিষয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করে যে জবাব পাওয়া গেছে তা হল, 'আপনাদের দেখার দরকার নেই। নাম করে যান।'

কাশীধামে ভক্ত পরিবৃত হয়ে বসে আছেন ঠাকুর। এমন সময় একদিন ঢাকার লালমোহন সাহা ঠাকুর দর্শন মানসে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আসবার সময় তিনি কতকগুলি ফল নিয়ে এসেছিলেন। ঠাকুরের সামনে ভক্তিভরে প্রণাম করে ফলগুলি ঠাকুরের হাতে দিতেই তিনি সব ফলগুলি বিলিয়ে দিলেন।

ঠাকুর একটা ফলও গ্রহণ করলেন না দেখে লালমোহন সাহা মনোকষ্ট পেলেন এবং নিজেকে বড় অভাজন বলে মনে করলেন।

পরদিন উক্ত লালমোহন সাহা আবার কতকগুলি ফল নিয়ে ঠাকুরের কাছে গেলেন ও যথারীতি প্রণাম করে ফলগুলি তাঁকে নিবেদন করলেন। ঠাকুর সব ফলগুলি বিলিয়ে দিয়ে একটি ফল হাতে করে লালমোহন সাহাকে বললেন, এবার হল ত, কাল যখন ফল নিলাম না তখন মনে মনে ভারী কষ্ট পেয়েছেন এবং নিজেকে তাই অভাজন বলে মনে করেছেন, তাই নয়? এই দেখুন, আজ আমি এটা গ্রহণ করলাম।'

লালমোহন সাহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হল।

ঠাকুর কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন ও ধ্যানস্থ হলেন।

তিনি কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন।

মনে হয় তিনি বলতে চেয়েছিলেন এ সংসারে কেউ অভাজন নয়। সবাইকে ভগবান সৃষ্টি করেছেন। এখানে কেউ অবহেলিত নয়। সকলের ভিতরই তিনি বিরাজমান। অথচ তাঁর সৃষ্ট বস্তু সবই কি নির্মল শুভ্র? জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে চোর ডাকাত আছে, সাধুসন্তও আছে। পিতামাতার পাঁচটি সন্তানের মধ্যে সব কটাই কি সাধু হয়? হয় না। কারণ প্রারব্ধ ভোগে সবাইকে ভুগতে হয়। সেই ভোগের দরুণ এই তারতম্যের সৃষ্টি।

সংসারে এসে শুধু ঘর বাঁধলেই চলবে না। ঘর সাজাতে হবে, ঘর গোছাতে হবে। নিত্য বস্তু দিয়ে ঘর একবার বাঁধতে পারলে সে ঘরের কোন ক্ষতি হবে না। প্রতিনিয়ত প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসে নিত্যর সঙ্গ করা দরকার, নইলে দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ ঝড়বৃষ্টির দাপটে নিজেকে অসহায় মনে করে সামনে একটা গাছের তলায় গিয়ে আশ্রয় নিলে, ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়।

বিশ্বাসকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করে কারও আশ্রিত হলে বিপদ থাকে না। ঈশ্বরাশ্রয়ের মত এমন নিরাপদ আশ্রয় আর পৃথিবীতে কোথায় আছে!

"আশ্রয় নিয়া ভজে কৃষ্ণ তারে নাহি ত্যজে"।

ঠাকুর বলেছেন, 'দেহই কালের বিবর, যাহার দ্বারা দাহন হয় অর্থাৎ তাপ ভোগ করে। এই দেহ সকলের মধ্যে যিনি দেহী তাহার ক্ষয় নাই। পরিবর্তনও নাই। কিন্তু অবিনশ্বর আত্মা বিনশ্বর দেহের সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে মিলিয়া মিশিয়া আছে বলিয়াই আত্মার জন্ম মৃত্যু আছে বলিয়াই মনে হয়। এই মিলিয়া মিশিয়া থাকার মূলে সুখদুঃখ কালো রূপ হৃদয়গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকেই জীব অমৃতত্ব লাভ করে। ইহা লাভ করিতে হইলে হৃদয়স্থিত কামনার বিনাশ, কর্ম ও কর্মফল ভগবানে

চরণে উৎসর্গ করিতে করিতে নির্বন্ধ হইতে হয় অর্থাৎ এই দেহকে মুক্ত করিতে যেটা যাহা করিতে হয় তাহা কেবল ভগবানের শরণ বই আর কিছুই নয়।'

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন চিন্তামণি গণেশের কাছে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে রয়েছেন।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজও তখন মিশরিপোখরার বাড়িতে আছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যেয় তিনি কাশীর বিভিন্ন ঘাটে বসে ভগবত চর্চায় সময় কাটাতেন। এটা ১৯২৩ সালের কথা গঙ্গার ঘাটে বসেই একদিন তিনি বন্ধুবর মহিমচন্দ্র সিংহের কাছে শুনতে পেলেন যে কাশীতে রামঠাকুর নামে এক মহান সাধক এসেছেন। উনি রামঠাকুর সকাশে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, ও পরদিনই চিন্তামণি গণেশের কাছে, ঠাকুর যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে গিয়ে হাজির হলেন।

প্রথম দর্শনে তিনি এতই মুগ্ধ হলেন যা ভাষায় বলবার নয়। ঠাকুরের বয়স তখন পঁয়ষট্টি বছর। অতি সাধারণ বেশ, গলায় তুলসীর মালা, গায় একটা সাদা চাদর, পরনে একটা ধুতি। ঠাকুর তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হল। আশ্চর্যের বিষয় তিনি লেখাপড়া বেশি জানেন না, সাধারণ জ্ঞানেরও অভাব। অথচ যে গভীর তত্ত্ব আলোচনা করলেন তাতে তিনি যে একজন অসামান্য মহাপুরুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, বিনয় ভাব, সৌম্যমূর্তির দিকে চোখ ফেললে বোঝা যায় যে তিনি সর্বত্রই ভগবান দর্শন করেন।

: রামঠাকুর কাশীতে মাঝে মাঝে আসতেন। কখনও বছরে দু-তিন বারও যেতেন। ডক্টর কবিরাজ মশায় তিনি এলেই তাঁর কাছে ছুটে যেতেন। তিনি বলেছেন, ঠাকুরের জীবন অলৌকিক রহস্যে ভরা। তিনি

কখনই প্রচার পছন্দ করতেন না। তাই তাঁর জীবনের অনেক কিছু জিনিস এখনও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। ভক্তগণের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর জীবনচরিত প্রকাশ করার কথা বলায় তিনি সম্পূর্ণ বিরোধিতা করতেন। এ সময় ডক্টর কবিরাজের অধ্যাপক প্রভাত চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁকে তিনি বলেছিলেন, ঠাকুরের মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর জীবনের ঘটনাপ্রবাহ যেন তাঁরা লিখে রাখেন। ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তিনি ষোল সতের বছর পর্যন্ত ঠাকুরের দর্শন পেয়েছিলেন। কথা বলতে বলতে যেসব তত্ত্ব তাঁর মুখে শুনেছিলেন তাই লিপিবদ্ধ করতেন। সেই লিখিত বিষয় থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল। এর দ্বারা সবাই বুঝতে পারবেন কি মহান চিন্তাধারা, কি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ ঠাকুরের ছিল।

ঠাকুর তাঁর শ্রীমুখ থেকে যে অমৃতময় বাণী বর্ষণ করেছেন ঠিক তাই উল্লেখ করা হল।

"ব্রজ শব্দের অর্থ ব রজ রজহীন অর্থাৎ প্রকাশহীন বা বিরজার পার বুঝিতে হইবে। ব্রজধাম চুরাশি ক্রোশ, তাহার বাহিরে বিরজা, বৃন্দাবন ব্রজধামের অন্তর্গত। ব্রজে শান্তি নাই, শান্তি আছে ব্রজের বাহিরে। ব্রজে সর্বদা আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলন সংকোচ ও প্রসার নয়, ইহার মূলে আছে যোগমায়ার প্রভাব। ব্রজধাম বস্তুতঃ মাধুর্য ধাম। এখানে গেলে আর ফিরিয়া আসে না। বৈকুণ্ঠ ও কৈলাস ঐশ্বর্য স্থান। এ দুটি স্থান ব্রজের বাহিরে। বৈকুণ্ঠ ও কৈলাস হইতে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু ব্রজভূমিতে প্রবেশ করিলে আর ফিরিবার প্রশ্ন থাকে না। ব্রজে যাইবার একমাত্র উপায় শরণাগতি—ঐ স্থানে কেহ কর্তা নাই।"

"শান্তি চাহিতে নাই। শান্তি ও অশান্তি উভয়ই ভাব। স্বভাব নয়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, করা ও না করা সবই কর্তৃত্বমূলক। প্রার্থনাটি ত্যাগ করিতে হইবে। ইচ্ছা বা কামনা থাকিতে ব্রজে গমন হয় না। ব্রজবাসীদের শান্তির প্রয়োজন হয় না। কারণ সেখানে স্বভাব আছে। স্বভাবই ঈশ্বর, আত্মা ভগবান।"

"এই দেহই দেবভূমি। দেহ চুরাশি আঙুল। ব্রজধামে চুরাশি ক্রোশ, ইহার মধ্যে ষোল ক্রোশ মথুরা। ভিতরে পঞ্চ ক্রোশ বৃন্দাবন। কেন্দ্রমধ্যে নিকুঞ্জভবন—নিকুঞ্জমাঝে কুঞ্জরহিত বা অংশহীন। ব্রজে শান্তভাব নাই। এখানে শুধু দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্যের খেলা আছে। একমাত্র শ্রীরাধাই সমস্ত ভাবের খনি। সখীগণ প্রভৃতি বিভাব অনুভাবাদি আনুষঙ্গিক হেতু। সখীগণের দ্বারাই যোগমায়ার বলে রাধাকৃষ্ণের মিলন ও বিরহ সংঘটিত হয়। ব্রজে কাহারও কর্তৃত্ব নাই। রাধারও নাই কৃষ্ণেরও নাই বা সখীগণেরও নাই। যোগমায়ার প্রভাবেই স্বভাবতই সব চলিতেছে। যেমন বায়ু বহিলেই গাছের পাতা বা কাপড় ইত্যাদি কম্পমান হয়। সেখানেও তেমনি সব স্বভাবের বলে হইয়া থাকে। কর্তৃত্ব থাকিলে অর্থাৎ অনুগত বা শরণাগত না হইলে ব্রজে প্রবেশ করা যায় না। শান্তভাবও ব্রজের বাহিরে। ঐ স্থানে চতুঃ সেন অর্থাৎ সনক সনন্দন প্রভৃতি অবস্থান করেন। সপ্তঋষিরও ঐ স্থান। জ্ঞানবলে ঐ পর্যন্ত যাওয়া যায়। ঐখানে অহঙ্কার আছে কারণ ঐখানকার বোধ প্রয়োজনের অভাব বোধ অর্থাৎ আমার প্রয়োজন নাই। এ প্রকারের বোধ ওখানে স্বাভাবিক।"

"জীবদেহে নিত্যলীলার অথবা নিত্যরূপের দর্শন হয় না। যাহা দর্শন হয় তাহা ভূতের ছায়া। স্বপ্ন দর্শন মাত্র। যতক্ষণ বিক্ষিপ্তভাবে থাকে ততক্ষণ জীবভাব আছে জানিতে হইবে। অনন্যচেতা হইলে জীবভাব থাকে না উহা শিবভাবে পরিণত হয়। ঐ অনন্যচেতার দেহ জীবদেহ নহে। ঐ দেহের মৃত্যু নাই তিরোভাব আছে মাত্র। নিত্যরূপ চিন্ময়রূপ তাহার দর্শন হইলে আর তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারা যায় না। বজ্রপাত হইলে যেমন তড়িৎপ্রবাহ আমাদের আকর্ষণ করিয়া লয়, অন্যদিকে যাইবার সামর্থ্য থাকে না, একেবারে তাহার নিজের করিয়া লয়। মহাপ্রভুর দেহ চিন্ময় ছিল তাহা বস্তুত অস্থি, রক্ত, মাংস প্রভৃতি ছিল না। যদি থাকিত তাহা হইলে তিনি টোটা গোপীনাথের অঙ্গে লুকাইয়া গেলেন কি রূপে? নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর তিরোধান

এই প্রকার জানিবে। কিন্তু আমরা কি প্রকার? যেমন লণ্ঠনের মধ্যে আলো। আলো নিভিয়া গেলে লণ্ঠন পড়িয়া থাকে। তাঁহারা সবই আলোকময়, আলো নিভিলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তাহাদের দেহ মহাভূতময়। তাঁহারা যখন আসেন তখন মহাভূত সঙ্গে লইয়াই আসেন। মহাভূত মানে স্বভাব—নির্গুণ, নির্বিকার প্রভৃতি। মন বুদ্ধি ও প্রাণ যখন এক হইয়া যায় তখন বুদ্ধি থাকে না বলিয়াই বিচার থাকে না। তাই তাহাকে পাইয়া 'আমি পাইয়াছি এই প্রকার বোধ থাকে না। চিনি ত চিনির আস্বাদ জানে না।

"ব্রজধামে আছে যোগমায়া তাহার বাহিরে পর ব্যোমে আছে মায়া। মায়া আবরণরূপে আছে মহামায়া বা অহঙ্কার। মহামায়ার আবরণ রূপে আছে মমত্ববোধ।"

"কর্তৃত্ব থাকিতে ব্রজে যাওয়া সম্ভবপর নয়। বড় জোর শান্তভূমি পর্যন্ত যাওয়া চলে। কর্তৃত্ব ছাড়িয়া উন্মুখ হইলে ব্রজের পথ পাওয়া যায়। কর্তৃত্ব বা পুরুষাকারের দ্বারা ব্রজে যাওয়া যায় না। বিচার করাই কর্তৃত্ব। শূন্যকে আশ্রয় করিলে বিচার থাকে না। ব্রজে সম্পূর্ণ নির্ভর ভাব। যত কিছু ভয় হউক বা যাহাই হউক তবু নির্ভর, নিজের চেষ্টা নাই।"

"জীব নিত্যদাস কারণ সে দাস হইয়াই উৎপন্ন। এখন বিষয়ের দাস, বিষয় কাটিয়া গেলে নিত্যের দাস। ব্রজে নিত্য কৈশোর শুধু বীজ ও অংকুর পর্যন্ত। প্রকৃত কাম নাই বলিয়া বিচার নাই, ডালপালা কিছুই হয় না।"

"যার একুল আছে তার ওকুলও আছে - দুই কুলই আছে। যার কুল নাই সে অকুল। অকুলে তরঙ্গ নাই। কুল থাকিলে তরঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।"

"সহ্য করিয়া যাইতে হয় - প্রবৃত্তি, কাম, লোভ প্রভৃতির বেগ সহিয়া থাকিতে হয়। তাহাকে প্রশ্রয়ও দিতে নাই, বাধাও দিতে নাই। একটা স্থির জিনিস ধরিয়া সহ্য করিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে

ঐগুলি নষ্ট হইয়া যায় আপনিই, কারণ উহাদের সীমা আছে। সীমা থাকিলে ক্ষয় হওয়া স্বাভাবিক ইহাকেই প্রারব্ধের ভোগ বলে। ইহাই—যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা।"

'স্থির বায়ুই অচলা সমভাব মিত্রভাব। অবয়বই দেহ—আত্মা নিরবয়ব। চারিদিকে যা কিছু দেখি সবই দেহ। ঘটের মধ্যে আকাশ ভাবিলে তাহাই খণ্ডাকাশ, তাহা সীমাবদ্ধ।"

"যখন জানি আকাশ ঘটের ভিতরে বাহিরে সমভাবে আছে, তখন আকাশ অসীম সাম্যময় আত্মা।"

"ঈশ্বর বলিতে বুঝায় স্বভাব, ইহাকেই কৃষ্ণ বলিয়া সেবা করা যায়। সেখানে অভাব নাই, প্রয়োজন নাই। চৈতন্য, শুদ্ধাকাশ, স্থিরবুদ্ধি, সাম্য—এইসব এক বস্তুরই বিভিন্ন নাম।"

"প্রারব্ধ ভোগ কাটে কিনা ইহাই অনেকের প্রশ্ন। ইহার উত্তর এই—কাটানো যায় কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বাস্তবিক পক্ষে ঐ ভোগ কাটে না। একমাত্র ভোগের দ্বারা উহার নিবৃত্তি হয়। যোগবলে অথবা অন্য কোন উপায়ে উহাকে সরাইয়া ফেলা যায় ইহা সত্য। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে কারণ এই দেহ অনিত্য বলিয়া কোন না কোন সময়ে উহার ত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। দেহত্যাগ হইলেই এ শূন্যস্থিত বিতাড়িত কর্মগুলি আকর্ষণ বলে আবার আমাকে দেহ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে। তবে সে দেহে আর নতুন কর্ম হইবে না ইহা সত্য। জীব যখন সংসারে আসে তখন স্বীকার পত্র দিয়া আসে—যে যে ভোগ তাহার প্রাপ্য তাহা অঙ্গীকার করিয়া আসে। তাই তাহাকে নিজের প্রাপ্য ভোগ গ্রহণ করিতেই হয়। যে তাহার শরণাগত তাহাকে তিনি ঐ দেহেই সমস্ত ভোগ করাইয়া নেন। পরে কাছে লইয়া যান আর তাহাকে আসিতে দেন না। তাহার কোন ভোগ বাকী থাকে না। ধৈর্যের সহিত প্রারব্ধ ভোগ করা উচিত, বাধা দিতে নাই। বাধা দিলে ভোগ কাটে না। একমাত্র অনুগত হইলে প্রারব্ধ কাটিতে পারে—প্রারব্ধ কাটিবার দ্বিতীয় উপায় নাই।"

" 'হরে কৃষ্ণ' প্রভৃতি ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর আর প্রণব একই বস্তু। হরে কৃষ্ণ রাম এই তিনটি অংশই প্রণবের তিনটি অবয়র অ, উ, ম, রাম মানে রতি বা প্রেম। কৃষ্ণ মানে একাগ্রতা। অতএব ইহার অর্থ সর্বদা স্থির হইয়া প্রেমের সহিত হরি নাম কর।"

"মন, বুদ্ধি ও প্রাণ এই তিনটি এক হইলেই প্রণব হয়। মন স্থির হইলেই বুদ্ধি জাগে বা চৈতন্যের উদয় হয় তখন প্রাণের সঞ্চার হয়।"

"সব জিনিসই গাঢ় বা সবুজ হইলে নীল হয়। জল গাঢ় হইলে নীল হয়। গাঢ় অগ্নি নীল। মধ্যাহ্নকালে সূর্যও তাই। গভীর আকাশও নীল। প্রদীপ নির্বাণ উন্মুখ হইলে একটা নীল জ্যোতি দেখা যায়। উহা গভীর জ্যোতি। উহার চারিদিকে একটা সুবর্ণ জ্যোতির বেষ্টন থাকে। ঐ সুবর্ণ জ্যোতিটিকে গৌর বলে—উহার ভিতরটি কৃষ্ণ।"

"পুরুষ মানে পৌরুষতা চেষ্টা। উত্তম চেষ্টাকে পুরুষোত্তম বলে।"

"কাশী দেহত্যাগের স্থান—এইখানেই দেহত্যাগ হয়। তারপর নন্দন বনে অর্থাৎ লীলাভূমিতে প্রবেশ হয়। ইহাই বৃন্দাবন, ইহাই কুঞ্জ প্রবেশ, ইহার মধ্যস্থানটির নাম নিকুঞ্জ।"

"সব আত্মাই সকলের পরিচিত। মলিনতাবশতঃ কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে না। চিনিলে আর পর থাকে না।"

"সত্য = সত্ত্ব, ইহাই সত্যযুগ। ত্রেতাং প্রাণ—প্রাণ হইলে দ্বাপর তখন শুধু দুইটি থাকে ভক্ত আর ভগবান। ভক্ত যখন ভগবান ভিন্ন অন্য কিছু জানে না, এই অবস্থায় কৃষ্ণলীলার প্রকাশ হয়। পরে কলি---তখন গৌর নিতাইয়ের প্রকাশ। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ মূলে একই বস্তু। অদ্বৈত হচ্ছেন মহাবিষ্ণু, যিনি সর্ব অবতারের মূল। নিত্যানন্দ সংকর্ষণের স্বরূপ। বলরাম প্রভৃতি বা জীব প্রভৃতির ইনি

উৎস। গৌরাঙ্গ লীলার প্রস্রবণ। কাশীতে ঠিক ঠিক বাস করিলে কাশীর ঠিক ঠিক ব্যাপার চিন্তা মাত্রই জানিতে পারা যায়।"

"বিশ্বনাথ—কালপুরুষ। ইনি সাতটি তারার সমষ্টি। এখানে আছেন মঙ্গলাদি চারিটি গৌরী এবং বিশ্বনাথ দণ্ডপাণি ও বৈকুণ্ঠেশ্বর। কাশী ত্রিশূলের ওপর অবস্থিত। শূল মানে দুঃখ বা তাপ। ইহা ত্রিতাপের ওপর।"

"ভগবান ও স্বভাবে কোন ভেদ নাই। স্বভাব মানে প্রকৃতি। অগ্নি ও প্রভায় যেমন ভেদ নাই ইহাও ঠিক সেইরূপ। ভক্ত তন্ময় বলিয়া পৃথক নহে।"

"সকল প্রকার কামনা গুটাইয়া একের মধ্যে ফেলিতে পারিলে কামের অবগুণ্ঠন হয়। উহাই কামবীজ। উহাই ভগবদ আরাধনার উপায়। বৃন্দাবনে উহারই প্রাধান্য। ভাবদেহ বীজরূপ। সমস্ত ব্রজই বীজ বা অব্যক্ত। এ বীজ হইতে অংকুর জন্মে না।"

"কিছু চাহিতে নাই—গুরুর দান অযাচিত।"

"যা দেখা যায় সেটা মিথ্যা। যে দেখে সেও ভুল দেখে।"

"গুরু যে বীজ দেন সেই বীজের সঙ্গে বাস করিতে হয়। উহার সঙ্গে ঘরকন্না করিতে হয়। উহাকে ভালবাসিতে হয়।"

"বীজের সঙ্গে বস্তুত গুরুই জন্মগ্রহণ করেন তাই ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।"

"গুরু নৌকাটিকে ঠেলিয়া লন। পরে শিষ্যকে দাঁড় টানিতে হয়। নতুবা শুদ্ধ গুরুর ঠেলাতে চলিতে হইলে শিষ্যের অত্যন্ত কষ্ট হয় কারণ সে সামলাইতে পারে না। নিজে দাঁড় টানিতে হয় শুধু বেগ সামলাইবার জন্য। গুরুতো সবটা দিয়া রাখিয়াছেন প্রয়োজন অনুসারে শিষ্য সবটাই প্রাপ্ত হয়।"

"ভোগ আসে আসুক বাধা দিতে নাই উহা আপনি কাটিয়া যাইবে। কাল পূর্ণ হইলে 'অবগুণ্ঠন' হইয়া বীজে পরিণত হইবে। বাধা দিলে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়।"

"দীক্ষার কাল আছে। নারী রজঃস্বলা হইলে যেমন পতিসঙ্গ আবশ্যক, তেমনি শিষ্যের ভিতরের প্রকৃতি যতক্ষণ রজঃস্বলা না হয় ততক্ষণ গুরু তাহাতে বীজ বপণ করেন না। এই বীজ হইতে সৃষ্টি হয়।"

"সুখদুঃখ কিছু নহে। ছেলেমেয়েরা যেমন পরস্পর খেলা করে এবং তার মধ্যে ঝগড়া মারামারি করে। কখনও কাঁদে, কখনও হাসে। কখনও হারে কখনও জেতে কিন্তু যেই মা খাইতে ডাক দেন অমনি সবাই খেলা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। মার কাছে যাইয়া সকলে আনন্দে মগ্ন হয়। পূর্ববর্তী খেলার সুখদুঃখ সব ভুলিয়া যায়। এও তাই। প্রথমে যেটা আগে সেটা ভগবানের, বাকী সব ভুতের।"

ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ যে তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার সবটা এখানে না দিয়ে কিয়দংশ দেওয়া হল। তিনি সর্বজন প্রণম্য হয়েছেন এই দুরূহ কার্যটি সাধন করে। যদি না উদ্যোগী হতেন, যদি তিনি ঠাকুরের কথা এইভাবে হৃদয়ের ভুর্জপত্রে ধারণ না করতেন, তাহলে জগৎবাসী ঠাকুরের এই অমৃতময় বাণীর আস্বাদ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হত।

ঠাকুরের আশ্রিত ভক্তমণ্ডলী ঠাকুরের আশীর্বাদে আজ জীবনের বহু কণ্টকাকীর্ণ পথ পরম নিরাপদে অতিক্রম করে চলেছেন নাম-কীর্তনের মাঝে। সত্যনারায়ণের মাঝে আজও তাঁরা কেউ কেউ ঠাকুরের নির্দেশ ও উপস্থিতি অনুভব করেন এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছু কিছু তথ্য বিবৃত হয়েছে আরও কিছু ভক্তদের কাছ থেকে যা জানা গেছে তাই সুবিধামত বর্ণনা করা যাবে।

আজ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে ঘোর অমানিশার অন্ধকার। অশান্তি বহ্নির লেলিহান শিখার তাপ প্রভাবে মানুষ আজ দিশাহারা। দারিদ্র্য বঞ্চনার হাতে মানব জীবন ক্ষত-বিক্ষত। ফলবান বৃক্ষ যেমন প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে ডালপালা ভেঙে গিয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় দিনাতিপাত করে আজ মানুষের অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছে।

এখনও কি ঈশ্বর চরণে আশ্রয় নেবার সময় হয় নি ? এখনও কি বিশ্বাস হল না যে অসহায় নাবালক শিশুর যেমন কোন ভাবনা নেই—কারণ পিতামাতা দিবারাত্র তার জন্য চিন্তা করছেন, তেমনি ভাবে পরমগুরু ভগবানও আমাদের সব কিছুর ভার নিয়ে আছেন।—তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে কি আমরা মহানন্দে নিবেদনের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে পারি না।

একবার বিশ্বাস করতে দোষ কি ?

মানবজনম লাভ করে জনমভর তো পরীক্ষাই দেওয়া হল। না হয় এ দুনিয়ার সব চেয়ে বড় পরীক্ষক সেই করুণাসাগর ভগবানকে একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।

সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। আয়ুর ফুল একটা একটা করে ঝরে পড়ছে। সমস্ত ফুল নিঃশেষ হয়ে যাবার আগে একবার তাঁর দিকে মুখ ফেরান যাক। দেখি তিনি আশ্রয় দেন না নিরাশ্রয় করেন।

হে রামচন্দ্রদেব, হে কাঙালের বন্ধু। তোমার চরণে শরণ নিয়ে সবাই যেন সেই দয়াল ভগবানের চবণে আশ্রয় লাভ করতে পারে।

গুরুকৃপাধন্য রোহিণীকুমার মজুমদার ঠাকুরের একজন ভক্তিপ্রাণ শিষ্য। তাঁর চরিত্রে এমন কতকগুলি গুণ ছিল যার ফলে তিনি সবাইকে আকর্ষণ করতে পারতেন। ঠাকুরকে তিনি দেবতাজ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। এরকম একনিষ্ঠ ভক্ত বর্তমানে বিরল।

একদিন ঠাকুরকে এক গুরুভ্রাতার মৃত্যুর কথা নিবেদন করা হয়। তার কোনো অসুখ ছিল না। হঠাৎ তিনি বাড়ির সবাইকে ডেকে বললেন, এবার আমি চলে যাব। এই বলে শ্রীঠাকুরের একটা ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে জপ করতে করতে দেহত্যাগ করলেন।

ঠাকুর এ কথা শুনেই বললেন, 'ভুগে ভুগে মরাই ভাল।' রোহিণী-বাবু বললেন, 'একথার মানে কি! তিলে তিলে কষ্ট পেয়ে মরার চেয়ে হঠাৎ মরণ ভাল নয় কেন?'

ঠাকুর বললেন, 'ভুগে মরলে তার ঈশ্বরের কথা মনে পড়ে। কষ্টের মাঝে সে নিরুপায় হয়ে কষ্ট লাঘবার্থে ভগবানকে ডাকে। রোগশয্যায় শুয়ে যখন সে দেখে স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়স্বজন কেউ কাছে আসছে না— সকলের যেন একটা বিরক্তি ভাব।

'মনের ভাব এই যে, হে ভগবান আর কত ভোগাবে এখন গেলেই বাঁচি।

'তখন রোগী চিন্তা করে—এই তো পৃথিবী, এই তো সংসার। স্ত্রী-পুত্র ভাই বোন কত আপনজন, অথচ তারা ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়। পাঁচবার ডাক দিলে একবার সাড়া দেয়। এমনি সংসারের জন্য মানুষ ঘর বাঁধে, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সবাইকে জড়িয়ে ধরে। তার পরিণাম এই! তখন তার মন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। বুঝতে পারে ঈশ্বর ছাড়া আর আপনজন কেউ নেই। শেষ সময়ে সে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে। কোন আকাঙ্ক্ষাই আর তার থাকে না। এই বোধ, এই জ্ঞান লাভের জন্যই ভুগে মরা অনেক ভাল।'

সত্য চিরকালই সত্য, তা কোনদিন মিথ্যা হয় না। এই উপলব্ধিতে পৌঁছনো তো মানুষের সাধনা। এই জ্ঞান লাভের জন্যই তো গুরুবরণ।

বাজার থেকে হাঁসের ডিম কিনে এনে খোলা ছাড়ালেই বাচ্চা মেলে না। দিনের পর দিন তা দিতে দিতে তবে বাচ্চা পাওয়া যায়।

এই তা দেওয়াই তো সাধনা।

এই সাধনার শেষ স্তর হল জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন।

ঠাকুর সে সময়ে মজঃফরপুরে রোহিণীবাবুর বাসায় আছেন। নোয়াখালি থেকে শুভময়বাবু দিন তারিখ দিয়ে পত্র দিলেন যে তিনি ঠাকুর সন্দর্শনে যাচ্ছেন।

ঠাকুর রোহিণীবাবুকে স্টেশনে পাঠালেন শুভময়বাবুকে নিয়ে আসার জন্য। সমস্যা দেখা দিল একটা। রোহিণীবাবু শুভময়বাবুকে কোনদিন দেখেন নি। কি ভাবে তাঁকে অত লোকের মধ্যে খুঁজে বার করবেন।

রোহিণীবাবু স্টেশনে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। কত লোক চলে যাচ্ছে। হঠাৎ একজন একটা ব্যাগ হাতে করে এসে একেবারে রোহিণীবাবুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিই কি রোহিণী মজুমদার?'

রোহিণীবাবু চমকে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি ভাবে বুঝতে পারলেন যে আমার নামই রোহিণীকুমার?'

শুভময়বাবু বললেন, 'যিনি চেনাবার তিনিই চিনিয়ে দিয়েছেন।'

দুজনে নিবিড় হয়ে এক সাথে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

ঠাকুর বললেন, 'কি রোহিণীবাবু চিনলেন তো।' দুজনেই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন ঠাকুরের দিকে। যার নামে মন আচ্ছন্ন থাকে তাকে অবশ্যই পাওয়া যায়। কিভাবে পাওয়া যায় তা বোঝা যায় না।

হাজারটা গরু চরে বেড়াচ্ছে মাঠে—তার মাঝে একটা বাছুর ছেড়ে দিলে সে ঠিক ঐ হাজারটা গরুর মধ্যে তার মাকে অবশ্যই খুঁজে পায়।

কারণ 'মাকে চাই' 'মার কাছে যাব' এই ভাব তার মনে থাকে।

রাতে ঠাকুর একটা চৌকির ওপর শয়ন করলেন আর শুভময়বাবু মেঝেতে। রাতে তাঁর ঘুম আসে না, ঐ বুঝি ঠাকুর উঠলেন ঐ বুঝি তিনি কোথাও গেলেন।

তিনি অনেকবারই দেখলেন ঠাকুর বিছানায় নেই; আবার কিছুক্ষণ পরে দেখেন ঐ তো শুয়ে আছেন।

এই আছেন, এই নেই। রহস্যময় এক খেলা।

এ লীলার মূল উদঘাটন করবার শক্তি নোয়াখালির প্রখ্যাত আইনজ্ঞ শুভময়বাবুর নেই।

সারা জীবন আইন নাড়াচাড়া করে নথিপত্র ঘেঁটে কত বড় বড় মামলার জটিলতার গিঁট ছাড়িয়ে জয়যুক্ত হয়েছেন। কত মানুষের প্রশংসা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর ওকালতির কোন ধারা এখানে খাটল না।

ভক্তপ্রবর রোহিণী মজুমদার ঠাকুরের সেবারত। ঠাকুর বললেন, 'সব সময় নাম জপ করবেন, এতেই সব হবে।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম জপ করলে কি হয়?'

ঠাকুর জবাব দিলেন, 'এই নামের দ্বারা যা ইচ্ছে তাই করা যায়।'

'কলকাতার রাস্তায় চোখ বন্ধ করে চলা যায়?'

ঠাকুর একটু জোরেই বললেন, 'হাঁা, চলা যায় একবার পরীক্ষা করে দেখুন না।'

'আজই পরীক্ষা করব।'

'বেশ তো করেই দেখুন না।'

রোহিণীবাবু বাসায় ফিরে এসে ভাবতে লাগলেন নামের মাহাত্ম্য। আমি আজই পরীক্ষা করব। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় অক্রূর দত্ত লেনের পাশে এক গলিতে টিউশানী করতেন। ডিকশন লেন, সার্পেনটাইন লেন, নেবুতলা জেলেপাড়া তারপর অক্রূর দত্ত লেন। তারপরও পাশের গলিতে ছাত্রটির বাড়ি।

তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে মনে মনে প্রণাম করে চোখ দুটো বন্ধ করে হাঁটা শুরু করলেন। নাম জপও করছেন মনে মনে। সঙ্কল্প এঁটেই বের হয়েছেন যে যতই বিপদ হক, চোখ দুটো কোনমতেই খুলবেন না। তিনি চলেছেন চোখ বন্ধ করে, আশপাশ দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে, সাইকেলও যাচ্ছে, মানুষের গায় মাঝে মাঝে নিজের শরীর লাগছে।

চলতে চলতে কত পথ যে গেছেন তা তার অনুমান নেই—তারপর কোথায় গিয়ে যেন তিনি কি একটা পায় বেঁধে পড়ে গেলেন।

এবার চোখ খুললেন।

দেখলেন ছাত্রের বাড়ির দরজায় এসে তিনি পড়েছেন।

ধাক্কা খেয়েছেন একটা পাথরে আঘাত লেগে।

ছাত্রটি ছুটে এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে ঘরে বসালেন।

রোহিণীবাবু বললেন, 'তোমরা ব্যস্ত হয়ো না, আমার কিছু হয় নি।'

সেদিন আর না পড়িয়ে সোজা এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে বললেন, 'পরীক্ষায় পাশ।'

ঠাকুর তখন সবাইকে বললেন, 'বুঝলেন সবাই, রোহিণীবাবু আজ আমাকে পরীক্ষা করলেন।'

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুগত শিষ্য মহাপ্রাণ পণ্ডিত ৺প্রভাত চক্রবর্তী তখন কাশীতে। তাঁর কয়েকজন বন্ধু ঠিক করলেন ঠাকুর সমীপে যাবেন।

এদিকে প্রভাতবাবু কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়লেন কারণ ঠাকুর ঐসব পণ্ডিতের সামনে উল্টোপাল্টা ভুল সংস্কৃত বলে একটা হাস্যকর পরিবেশ সৃষ্টি না করেন।

তিনি সরাসরি এসে ঐসব বলায় ঠাকুর বললেন, 'কোন চিন্তা নেই, আপনার অসম্মান হয় এমন কাজ আমি করব না।'

যথাসময় প্রভাতবাবুর বন্ধুবান্ধবরা ঠাকুর সমীপে এলে ঠাকুর একটা সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

কেউ কেউ ঠাকুরের মুখে ঐ ধরনের শ্লোক শুনে একটু হাসলেন। প্রভাতবাবুর মুখ লজ্জায় আরক্তিম হয়ে গেল।

ঠাকুর তাঁদের বললেন, 'আমার শ্লোক শুনে আপনারা মনে মনে হয়ত একটু অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কারণ শ্লোকটিতে বোধ হয় বিভক্তির দোষ আছে। আপনারা যদি অনুমতি দেন তো বুঝিয়ে দি ওটা মোটেই ভুল নয়।'

সবাই বললেন, 'বেশ তো বলুন, আমরা শুনি।'

ঠাকুর বললেন, 'বি-ভক্তি মানে ভক্তিহীনতা। তারপর ভক্তিহীনতা ও শ্রদ্ধা সম্বন্ধে বলতে বলতে ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা করলেন দীর্ঘ সময় ধরে। সেই জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুনে পণ্ডিতমণ্ডলী এত মুগ্ধ হলেন যে ঠাকুরের চরণে বার বার ক্ষমা চাইলেন।

আর তাঁর সামনে কি খাপ খোলা যায় ?

অপর পক্ষের তরবারীতে কি রকম ধার আছে সেটা অনুমান করা দরকার। ধার অনুমান না করে লড়তে গেলে নিজের মুণ্ডুই কাটা যায়।

এখানে ঠাকুর সেই কথাটাই বুঝিয়ে দিলেন।

প্রভাতবাবু ঐ হিমালয়সদৃশ মহাজ্ঞানী ঠাকুরের দিকে চেয়ে বললেন, 'বাবা এতও তুমি জান। তোমার অজানা যে কি আছে তা আমার জানা নেই! আমরা তোমার কাছে শিশু ছাড়া আর কিছুই নয়।'

ঠাকুর আর কোন কথা বললেন না।

বই পড়ে যে জ্ঞান লাভ করে তাকে বলে বইজ্ঞানী।

আর কিছু না পড়ে, কিছু না জেনে যে জ্ঞান লাভ হয় তা হচ্ছে আত্মজ্ঞান।

পরমাত্মার সঙ্গে যিনি বাস করেন তিনিই আত্মজ্ঞানী।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায় রাবড়ি এনে রোহিণীবাবুর স্ত্রীর হাতে দিতেন। কিছু জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'এক ভক্ত দিয়েছে।' রোহিণীবাবু জানতেন, ঠাকুরের জানাশোনা মানুষ এদিকে বেশি নেই। রাবড়ি কেনার পয়সাই বা তিনি কোথায় পান।

একদিন সন্ধ্যায় দেখা গেল ঠাকুর একটা মিষ্টির দোকান থেকে এক হাঁড়ি রাবড়ি নিয়ে বের হলেন। রোহিণীবাবু দেখতে পেয়ে তার পিছু নিলেন। দেখতে হবে কোথায় ঠাকুর যান।

কিছুদূর যাওয়ার পর একটা পুকুর ধারে একটা আস্তাকুঁড়ে রাবড়িটা রেখে তিনি ফিরলেন। রোহিণীবাবুও ঠাকুরের পিছু পিছু চলে এলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি ঠাকুরকে বললেন, 'আজ বড় অন্যায় কাজ করেছি!'

ঠাকুর বললেন, 'আমি সব জানি; আপনি আমার পিছু নিয়েছিলেন।'

রোহিণীবাবু অবাক হলেন এই ভেবে যে উনি কিভাবে দেখলেন!

পরে বললেন, 'আপনি রোজ রাবড়ি আনেন কিন্তু আপনি খান না। আজ দেখলাম একটা আস্তাকুঁড়ে হাঁড়িটা রেখে এলেন।'

ঠাকুর বললেন, 'আর বলেন কেন! ঐ আত্মাটা যেটা আমাদের বাড়িতে ছিল, রাতভোর ঘুমুতে দেয় না, শুধু বলে রাবড়ি খাব। রোজ রোজ শুনে আজ তাই এক হাঁড়ি রাবড়ি দিয়ে এলাম। দোকানে দাম বাকী আছে—দু' টাকা চার আনা কাল দিয়ে দেবেন।'

একটু থেমে বললেন, 'হাঁড়িটা রাখা মাত্র দেখলাম একটা কাল ছায়া এসে ঐ হাঁড়িটার ওপর বসল আর সে কি চপ্‌চপ্ শব্দ—পারেন তো দেখে আসেন হাঁড়িটা কি অবস্থায় আছে।

একটা হ্যারিকেন নিয়ে রোহিণীবাবু দেখেন আস্তাকুঁড়ে হাঁড়িটা একেবারে চাচামোছা অবস্থায় পড়ে আছে।

প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী পি. আর. এসের থিসিস্‌টা কিছুতেই লিখে শেষ করে উঠতে পারছেন না। কলকাতায় বসে হৈচৈ এর মধ্যে এই সব দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা খুবই কঠিন। তাই তিনি ঠিক করলেন ঠাকুরকে নিয়ে বৃন্দাবন যাবেন। সেখানে দুমাস ঘর ভাড়া করে একটা ঘরে ঠাকুর থাকবেন আর একটা ঘরে নিরিবিলি লেখাটা হয়ে যাবে। থিসিস্‌টা শেষ করবেন।

এই মানসে তিনি ঠাকুরকে বললেন, 'আপনার কোন চিন্তা নেই। যা করার আমি করব আপনি শুধু বসে থাকবেন।'

ভক্তবৎসল ঠাকুর তাঁর অনুরোধে বৃন্দাবন রওনা হলেন।

যথারীতি ঘরভাড়া করে একটা ঠাকুর ও একটা চাকর রাখা হল।

ঠাকুর এক ঘরে আর উনি এক ঘরে বসে থিসিস্ লেখেন।

নিত্য ঠাকুরের যথাসাধ্য ভোগ দেওয়া হয়। প্রভাতবাবু কিছুই দেখেন না শুধু একমনে থিসিস্ লিখে যান।

তিন চারদিন বাদে প্রভাতবাবুর খেয়াল হল দেখিতো ঠাকুর কি করছেন। গিয়ে যা দেখলেন তাতে ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে তিনি মুহ্যমান হয়ে গেলেন। ঠাকুর সেই একই আসনে বসে আছেন। চার দিন ধরে তাঁকে যা ভোগ দেওয়া হয়েছিল সবই তেমনি পড়ে আছে। তিনি কিছুই স্পর্শ করেন নি।

তিনি ঠাকুরকে বেশ একটু উষ্মার সঙ্গে বললেন, 'আমার চরম শিক্ষা হয়েছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনাকে এভাবে এনে কষ্ট দেওয়া ঠিক হয় নি। আমার থিসিস্ লেখা শিকেয় পড়ে থাক।

'পি. আর. এসের আর দরকার নেই। টাকা রইল, যে কয়দিন আপনি থাকতে চান থাকবেন আমি চললাম।'

এই বলে তিনি বিছানা বেঁধে ফেললেন।

ঠাকুর এবার খুব নরম সুরে বললেন, 'আমাকে একলা ফেলে আপনি কোথায় যাবেন? আমার কি দোষ বলুন—আপনি বলেছেন শুধু বসে থাকতে আর কিছুই করতে হবে না। আপনার কথা আমি রেখেছি কিনা বলুন।'

প্রভাতবাবু একজন কৃতী অধ্যাপক। চোখের জলে তাঁর বুক ভাসে। ঠাকুর নির্বিকার।

গুরু ও শিষ্যের এই মান-অভিমানের দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ঠাকুর তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। তাঁরও চোখে জল বুঝি টলটল করে ওঠে।

এইতো চোখের জল—এর আস্বাদ যদি কেউ গ্রহণ করত তাহলে সে বুঝতে পারত কতখানি ভক্তির স্বাদ তাতে আছে। এরই নাম অনন্য ভক্তি।

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্মযোগ জ্ঞান
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল
কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে
কৃষ্ণোন্মুখ সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে।"

প্রভাতবাবু আবার বিছানার বাঁধন খুলে বলতে লাগলেন, 'এবার থেকে দুএক মুঠো কিছু মুখে দেবেন আমাকে আর কষ্ট দেবেন না।'

ঠাকুর বললেন, 'বাঁধন খুলে ফেললেন এবার ; আপনাকে পায় কে, বন্ধনেই তো যত গোলমাল।'

ঠাকুর আর কিছু বললেন না।

প্রভাতবাবু আবার থিসিস্ লেখায় মন দিলেন। বেশ মন প্রাণ দিয়েই তিনি লিখে চলেছেন।

বাঁধন আলগা না হলে কোন কাজ সমাধা হয় না।

গরু যতক্ষণ খুঁটিতে বাধা থাকে ততক্ষণ মনের মত কাজ করতে পারে না। যা পায় তাই খায় আর লেজ দিয়ে মশা মাছি তাড়ায়।

কিন্তু বাঁধন যেই খুলে দেওয়া হল অমনি সে ছুটে ছুটে বেড়ায়। মনের আনন্দে ঘাসটা পাতাটা খায়।

মানুষ এ সংসারে খুঁটিতে বাঁধা আছে। দুঃখ কষ্টের মশা মাছি অনবরত তাড়াচ্ছে আর দাপাচ্ছে। মনের মত কাজ একটাও হল না। এই বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন শেষ হয়ে যাবে। একমাত্র সদ্গুরু পারেন বাঁধন খুলে দিতে, তখন আর ভয় থাকে না।

তারপর একদিন প্রভাতবাবু থিসিসটা রেজেস্ট্রী করে পাঠিয়ে দিয়ে এসে ঠাকুরকে বললেন, 'বাবা লেখাটা পাঠিয়ে দিয়ে এলাম।'

ঠাকুর বললেন, 'পাঠিয়ে তো দিলেন কিন্তু কি লিখলেন তা তো বললেন না।'

প্রভাতবাবু চমকে উঠলেন, তাইতো লেখাটার তো কোন নামকরণই করা হয় নি—কি হবে!

আবার তাড়াতাড়ি ছুটলেন পোস্ট অফিসে। অনেক অনুরোধ করে লেখাটা ফেরৎ নিয়ে শিরোনাম লিখলেন – 'স্বাস্থ্যপন্থা গুরু বিনা'।

প্রভাতবাবু ঐ লেখাতেই পি. আর এস পেয়ে ডক্টরেট হলেন। গুরুকৃপা যার হয় এমনি ভাবেই হয়।

শিষ্য যদি ভক্তিময় হয় গুরু তাকে সবসময় রক্ষা করেন।

আপদে গুরু, বিপদে গুরু, সম্পদে গুরু, সুখে গুরু, দুঃখে গুরু। সারা দেহমনকে গুরুময় করতে পারলে তার আর কিছুই দরকার হয় না। গুরুই তাকে হাত ধরে বালকের মত টেনে নিয়ে বেড়ান।

জীবনতরী যতই জীর্ণ হক আর দীর্ণ হক, গুরু সহায় থাকলে তিনি ঠিকই গুণ টেনে কিনারে নিয়ে যান।

নিশিদিন ভরসা রাখিস হবেই হবে।

ভরসা রাখতে পারলে সবই হয়।

থামের ভিতরও ভগবানকে দেখা যায়। পাহাড় থেকে ফেলে দিলেও মরণ হয় না, বিষও অমৃত হয়, বনের হাতি বাঘও হিংসা করে না। ভক্ত ধ্রুব হাতিকে ভয় করা দূরে থাক অনায়াসে কাছে যায়। সে ভাবল ও বোধহয় কৃষ্ণের খবর জানে; তাই কেঁদে কেঁদে বলেছিল, কৃষ্ণকে কোথায় পাই বলতে পারিস? ওরে তোরা বল কোথায় গেলে তাঁকে পাব?

একদিন রোহিণীবাবুর স্ত্রী ও তাঁর বিধবা ভগ্নী ছাদের ওপর ঠাকুরের মাথাটা কোলের ওপর রেখে বসে আছেন। ঠাকুরের কোন সাড়া নেই। তিনি যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন, নড়াচড়া কিছুই নেই।

মশার কামড়েও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। দেখতে দেখতে ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল। ঠাকুরের দেহে ঠেলা দিয়েও কোন সাড়া মিলল না। নিঃশ্বাসও তো বইছে না। চিন্তার কথা—সাড়া নেই, শব্দ নেই এ আবার কেমন ভাব।

হঠাৎ ঠাকুর উঠে বসলেন পরে বললেন, 'বড় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

রোহিণীবাবু ঠাকুরের পা দুটি জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বলতেই হবে এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলেন?'

ঠাকুর বললেন, 'অনেকদূর নিয়ে গিয়েছিলেন গুরুদেব, তাই ফিরে আসতে দেরী হল।'

বোঝা গেল ঠাকুর সূক্ষ্ম দেহে গুরু সন্নিধানে ঘুরে এলেন।

রোহিণীবাবু প্রতিদিন সন্ধ্যায় মজঃফরপুরে ক্লাবে যেতেন। একদিন ক্লাবে সবাই গল্পে মেতে উঠেছেন। সবাই বিবাহিত সুতরাং আলোচনার গণ্ডী শ্লীলতা অতিক্রম করে সামান্য আদিরসাত্মক হয়ে উঠল।

তিনি রাত এগারটা নাগাদ ফিরলেন। ঠাকুর বসে আছেন।

তিনি এসে প্রণাম করতেই ঠাকুর বললেন, 'এত রাতে কোথায় ছিলেন?'

'ক্লাবে।'

'এত রাত পর্যন্ত ক্লাবে থাকা উচিত নয়। তাছাড়া ঐসব নোংরা আলোচনা করার মাঝে কি গৌরব আছে। ঐসব আলোচনা মানুষকে নীচেই নামায়। এ ধরনের আলোচনা ভবিষ্যতে আর করবেন না।'

রোহিণীবাবু লজ্জায় অধোবদন হলেন।

অন্তর্যামী ঠাকুর এখানে বসেই সব কিছু জেনেছেন।

তাঁর জীবনী কেউ লিখুক বা প্রচার করুক শ্রীশ্রীঠাকুর তা কোন দিনই চান নি—বার বার তিনি বলেছেন যে যাঁর জীবনই নেই তাঁর আবার জীবনী।

কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন জীবনের যে সব ঘটনা তিনি দেখিয়ে গেছেন বা অনেকে যা দেখেছে তা একসঙ্গে গ্রথিত করলে একটা মহাজীবনই তৈরি হয়ে যায়।

সব ঘটনা সব সময় তাঁর প্রকট অবস্থায় সবাই লিপিবদ্ধ বা মনোগ্রাফী করে রাখতে পারে নি। যাঁরা কিছু কিছু রাখতে পেরেছেন বা শ্রীদেহে অবস্থানকালে যারা তাঁর সঙ্গ করে যে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন তাই আজ টুকরো টুকরো বইরূপে প্রকাশিত হয়ে ভক্তসমাজে আনন্দবর্ধন করছে। তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের কাহিনী আজও অনেক গুপ্ত আছে। কিভাবে কখন কোথায় সাধন ভজন করেছেন তাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

যে সব ঘটনা সবাই প্রত্যক্ষ করেছে বা সঙ্গ করে তাঁর বাণী সংগ্রহ করে রেখেছে সেই সব নিয়েই তাঁর নামে আজকের বই।

এখানে জীবনী নেই আছে মৃতসঞ্জীবনী।

কাহিনী নেই আছে অমৃত প্রবাহিনী তরঙ্গ।

ব্যাখ্যা নেই আছে ঈশ্বর শরণ মননের আখ্যান।

যেটুকু পাওয়া গেছে বা ভক্তসমাজে পরিবেশন করা হয়েছে তা ভক্তিসহকারে অনুধাবন করলে বোঝা যায় কি বিরাট জ্ঞানবৃক্ষ ছিলেন তিনি।

এমন ভক্তবৎসল, এমন প্রেমিক গুরু, এমন ভক্তিসাধক যাঁদের কৃপা করেছেন তাঁরা ধন্য হয়ে গেছেন। তাঁদের জীবনের মরুভূমিতে মরুদ্যানের সৃষ্টি হয়েছে।

কত ঘটনা, কত ভক্তের চাক্ষুস দেখা দৃশ্যাবলী আজও অজ্ঞাত রয়ে গেছে তার হিসাব নেই। যা পেয়েছি তাই দিয়েই হৃদয় মন ভরাতে হবে, এ ছাড়া আর পথ কোথায়।

আরও কিছু জানা গেছে শ্রীসুধীরকুমার সেনচৌধুরীর মুখে। তিনি একজন ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত। তিনি ইচ্ছা করলেন যে যাদবপুর আশ্রমে কৈবল্যনাথের একটা আলেখ্য আছে সেইটা এনে প্রতিষ্ঠা করে উৎসব করবেন।

অনুষ্ঠানের কোন প্রস্তুতি ছিল না। আলেখ্য আনা হল। যাঁর পূজা তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিলেও কিছু একটা সমস্যা দেখা দিল, প্রাত্যহিক পূজা কে করবে? কারও যে মন্ত্রদীক্ষা হয় নি। তবে কি ভাবে পূজা হবে? নামই বা কে দেবেন? ঠাকুরও ধারেকাছে নেই, তিনি আছেন চৌমুহানীতে। সবাই চিন্তাকুল কি হবে এই নিয়ে। আগে-ভাগে চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হলে এখন আর এত চিন্তিত হতে হত না। কারও মাথায় কোনো সমাধান দেখা দেয় না।

এমন সময় সুধীরবাবুর তিন বছরের কন্যা অনুরাধা নাচতে নাচতে বলে উঠল—'নামই পূজা'।

সবাই নিশ্চিন্ত হলেন যাক জানা গেল নামই পূজা। তবে আর ভাবনা কি? দয়াল ঠাকুর কৃপা করে ঐটুকু মেয়ের মুখ দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে ভক্তদের নিশ্চিন্ত করলেন।

এটা যদিও জীবনী নয় কিন্তু এ ঘটনা তাঁর জীবনের একটা পর্দা। একটার পর একটা ছবির মত দেখা যাচ্ছে।

ঠাকুর যেন অনবরত সারা জীব জগতকে এক্স্‌রে করে চলেছেন। তাই তাঁর চোখে সব কিছুই ভেসে ওঠে। কে কোথায় কি করছে কে কোন সমস্যায় পড়েছে সব কিছুই তিনি দেখছেন আবার সমাধানও করে দিচ্ছেন।

একদিন রোহিণীবাবুর স্ত্রী ও বিধবা ভগ্নী ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছেন। তখন সকাল নটা কি সাড়ে নটা। এমন সময় ছাদে কি একটা পড়ার শব্দ হল। ওরা দুজন ছাদে গিয়ে দেখলেন একখানা বড় আমসত্ত্ব পড়ে আছে—এক পাশে একটা কাক কা কা করতে করতে উড়ে গেল।

আমসত্ত্বখানায় কাকের ঠোঁটের দাগ আছে।

তারা আমসত্ত্বখানা এনে ঠাকুরকে বললেন, 'একটা কাক এটাকে মুখে করে এনে ফেলে দিয়ে গেছে।'

ঠাকুর শুধু বললেন, 'আপনারা খেয়ে ফেলুন।'

'কাকের মুখের জিনিস কিভাবে খাই।'

'কেন! ঐ ঠোঁটের দাগটা যেখানে আছে সেইটুকু ফেলে দিয়ে খেয়ে ফেলুন।'

তাঁর কথায় সবাই মহানন্দে খেলেন। আমসত্বের প্রতিটা স্তরে দুধের সর ও মিছরির গুঁড়ো দেওয়া ছিল।

আমসত্ব কোথা থেকে এল কিভাবে এল তা আর ঠাকুরকে কেউ জিজ্ঞেস করল না।

কয়েকদিন পর মালদা থেকে এক ভক্ত চিঠি লিখে ঠাকুরকে জানালেন যে তিনি আমসত্ব খেতে চেয়েছিলেন, তাই অত্যন্ত যত্ন সহকারে একখানা আমসত্ব তৈরি করা হয়েছিল। তিনি আসব আসব করে না আসায় প্রায়ই ছাদে নেড়ে দেওয়া হত। হঠাৎ একদিনের অন্যমনস্কতায় একটা কাক সেটা মুখে করে নিয়ে চলে গেল। বড় আশা ছিল ঠাকুরের ভোগে দিয়ে ধন্য হব, সে ভাগ্য আর হল না।

সবাই বলে উঠলেন, 'তবে আমরা কি সেই আমসত্ব খেলাম।' ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ, তাই তো খেলেন।'

এরপর ঠাকুর চিঠি লিখে ভক্তকে জানালেন যে আমসত্বখানা ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে ও তার আশা পূরণ হয়েছে।

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীঠাকুর একলাই এক বাড়িতে ছিলেন। একাকী থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর একদিন ভয়ানক জ্বর হল, সারা দেহ যন্ত্রণায় কাতর। সেবাযত্ন করারও কেউ নেই।

সব দরজা জানলা বন্ধ করে ঠাকুর শুয়ে কাতরাতে লাগলেন। এই সময় তাঁর মনে হল ছোট ছোট দুখানা হাত দিয়ে কে যেন তাঁর পদসেবা করছে। ঠাকুর তাঁর সেবাযত্নে পরম পরিতৃপ্তিতে নিদ্রা গেলেন। সকালে উঠে তিনি সন্ধান করে কাউকে খুঁজে পেলেন না। কে তবে

সারারাত তাঁর সেবাযত্ন করল? দরজা জানলা তো বন্ধই আছে তবে কি করে সে এল!

তিনি ছাদে গিয়ে দেখলেন একটা টালি খোলা।

হঠাৎ দেখলেন একটা বানর বসে আছে—ঠাকুরকে দেখা দিয়েই চলে গেল।

এতক্ষণে ঠাকুর বুঝলেন সারারাত ধরে কে তাঁর পদসেবা করেছে।

সেবার ডিঙামানিকে উৎসব হবে।

সালটা ১৯৪৯। উৎসবের দিন ধার্য হল ১১ই থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারী।

এই উৎসবে হাজার হাজার লোক তিন দিন ধরে আনন্দে নাম কীর্তন ও প্রসাদ পেয়েছিলেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে। তখন পাকিস্তানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ চলছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কিভাবে যে সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী যোগাড় হল কে জানে।

এতবড় উৎসবের ব্যয়ভার গ্রহণ করা স্থানীয় ভক্তদের পক্ষে অসম্ভব। ফর্দানুযায়ী টাকার সামান্য ভগ্নাংশও জোটান গেল না। সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভক্তদের মধ্যে বেশ একটা দুশ্চিন্তার ঢেউ প্রবাহিত হল। উৎসবের মাত্র আর সাত দিন বাকী, অথচ কোন কিছুরই যোগাড় হল না।

ঠাকুরের নির্দেশ ছিল—ভক্তদের যেন সেবাযত্নের কোন ত্রুটি না হয়।

কিন্তু কি হবে?

এ তো বর্তমানের গান-বাজনার অনুষ্ঠান নয়। অমুক নাম করা অভিনেতা, অমুক নামকরা সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। পাঁচ টাকা, দশ টাকা, বিশ টাকার টিকিট হাজার হাজার বিক্রী হয়ে গেল। টাকাও উঠে এল।

এ যে ভগবানের উৎসব—এখানে সারাদিন নামকীর্তন হবে এর জন্য আর কার আকুলিবিকুলি আছে।

ভগবানের নামে পকেট থেকে অত সহজে আজকাল টাকাপয়সা বের হয়ে আসে না।

ডাক্তার রাখাল পাল একজন ভক্ত। তিনি অবশেষে বললেন, 'আমাদের কিন্তু মস্ত ভুল হচ্ছে। আমরা নিজেরা এক একজন কর্তা সেজে কর্তামি করছি। কিন্তু তাতে করে কি আজ পর্যন্ত আমরা একটা পয়সাও সংগ্রহ করতে পেরেছি? ঠাকুরের শক্তি ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারব না। এ বোধ আমাদের হারিয়ে গেছে।'

অবশেষে দুজন চলে গেলেন ঠাকুরের কাছে। নির্দেশ পেলেন যে তাদের কিছুই করতে হবে না। ভেদেরগঞ্জে গিয়ে লালমোহন সাহার ওপর সব ভার ছেড়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেই দুইজন সোজা লালমোহন সাহার কাছে গিয়ে সব কিছু বলতেই তিনি বললেন, 'আপনারা যান, আমি কালই আপনাদের মাঝে যাচ্ছি. সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পরদিন লালমোহন সাহা এলেন। উৎসবের কার্যসূচী বা অন্যান্য সব কিছু ঠিক হয়ে গেল।

উৎসব বিরাট আকার ধারণ করল। কোথা থেকে টাকা আসতে লাগল, দ্রব্যসামগ্রী আসতে লাগল তার খোঁজ নেবার সময় কোথায়। কোন অসুবিধাই দেখা দিল না। হাজার হাজার লোক প্রসাদ পেল। তিনদিন সারা ডিঙামানিক গ্রাম আনন্দ সাগরে ভাসল। স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, হিন্দু মুসলমান সবাই এসে সে আনন্দের ভাগ গ্রহণ করল।

পরম ভক্ত চেরাগ আলী এসে উৎসবে যোগ দিয়ে নামকীর্তনে মাতলেন। আশেপাশে চারিদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। দূরে অদূরের দশ বারখানা গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছে এই মহামিলন উৎসবে।

সবাই প্রসাদ পাচ্ছে। কোন ত্রুটি নেই, কোন বিশৃঙ্খলা নেই। কি অপরূপ, কি মাধুর্যময় সে দৃশ্য।

জাত নেই, কুল নেই, সবাই পাশাপাশি বসে প্রসাদ পাচ্ছেন।

এ দৃশ্য দেখাও সৌভাগ্য।

কিন্তু যাঁর উৎসব তিনি কোথায়?

তিনিও আছেন এই জনারণ্যে মিশে। তিনি না থাকলে হাজারটা লালমোহন সাহা বা হাজারটা রাখাল পালের কি সাধ্য যে এতবড় উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে?

যাঁর উৎসব তিনিই সুসম্পন্ন করলেন। তাঁর কৃপা ছাড়া এ বিরাট যজ্ঞ কোনমতেই সম্পন্ন হতে পারে না। একটা মানুষের নামে হাজার হাজার মানুষ এসে উপস্থিত। এ দৃশ্য সবাই দেখলেন!

হে দয়াল রামচন্দ্র ঠাকুর, মানুষের বেশে মানুষের মত আচরণ করে ঈশ্বরের প্রতিম যে লীলাখেলা করে গেলেন তা আমরা অনেকে দেখলাম। আবার অনেকের দেখার সৌভাগ্য হল না। যাদের তা হল না, তাদের তুমি আশীর্বাদ কর, তারাও যেন এ লীলার প্রত্যক্ষদর্শী হয়।

তুমি আমায় কৃপা কর, আমার তাপদগ্ধ হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দাও। তাদের আপনজনের মত কাছে টেনে নাও। তোমার নাম স্মরণ করে তারা যেন এ ভব বৈতরণী অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে।

চাঁদপুরে রোহিণীবাবুর বাসায় ঠাকুর আছেন।

একদিন বিকালে মা আনন্দময়ী ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

একথা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

বিকালে মা আনন্দময়ী এলেন।

ঠাকুরের ঘরে নিয়ে গিয়ে একই চৌকির ওপর দুজন বসলেন।

কারও মুখে কোন কথা নেই। দুজন দুজনার দিকে চেয়ে আছেন।

এই দৃষ্টি বিনিময়ের কি যে ভাষা তা বোঝা গেল না।

কিছুক্ষণ পর মা আনন্দময়ী বললেন, 'এবার যাই।'

ঠাকুর বললেন, 'আসেন।'

আরও কয়েকবার তাঁরা দুজন একত্র হয়েছেন কিন্তু কারও কোনও অভিব্যক্তি কিছু জানা যায় নি।

কলকাতার হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে রোহিণীবাবু যখন থাকতেন সে সময় ঠাকুর প্রায়ই তাঁর বাসায় আসতেন। একদিন বাজার থেকে একটা কাঁঠাল কেনা হল।

রোহিণীবাবুর মা বললেন, 'কাঁঠালটা রেখে দেওয়া হক। ঠাকুর এলে ভোগ দেওয়া হবে।'

কাঁঠালটি রেখে দেওয়া হল। কিন্তু ঠাকুর আসেন না, এদিকে কাঁঠালটি পচল না বটে কিন্তু হালকা হয়ে গেল।

রোহিণীবাবুর মা বললেন, 'আর কি হবে কাঁঠালটা গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হক।'

কাঁঠালটি গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হল।

সেটা স্রোতের টানে কোথায় যে গেল কে জানে।

বেশ কিছুদিন পর ঠাকুর এসেই তাঁর মাকে বললেন, 'বেশ সুন্দর কাঁঠালটি পাঠিয়েছিলেন; যেমন মিষ্টি তেমন রসাল।'

মা বললেন, 'কাঁঠালটা তো গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

ঠাকুর বললেন, 'যে যা দেয় তা আমার কাছে ঠিক পৌঁছায়।'

আজন্মের লীলাক্ষেত্র জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়া যে কি হৃদয়বিদায়ক ত যারা ভুক্তভোগী তারাই জানে। যে মাটিতে শৈশব যৌবন প্রৌঢ়ত্ব কেটেছে সে মাটি ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে জন্মের মত পাড়ি দিয়ে

গেলে বুকটা যে কতখানি ফেটে যায় তা লক্ষ লক্ষ ভিটেছাড়া মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে। এ মাটি আমার নয়! এই যে সহস্র স্মৃতিঘেরা মুলি বাঁশের বেড়া দেওয়া মাটির ঘর, এও আমার নয়। এই যে তুলসীমঞ্চ, এই যে ঠাকুর ঘর, এই যে দোয়েল শ্যামার বাসা বাঁধা আম জামের গাছ, সবই ফেলে যেতে হবে। লাউয়ের মাচায় ফুল ধরেছে, আর কদিন বাদেই লাউ ধরবে। দোপাটি গাছের ডালে ডালে কুঁড়ি ধরেছে, আর কদিন বাদেই ফুল ফুটবে। শ্যামলী গরুটার আর কমাস বাদেই বাছুর হবে—কোন কিছুই ঠাকুরের ভোগে লাগবে না। ঘাসের উপর শিশির পড়ে ভোরবেলায় মুক্তোর মত কেমন টলমল করে তাও আর দেখতে পাওয়া যাবে না। ছুটো চড়াই দম্পতি তার তিনটে বাচ্চা নিয়ে রোজ সকালে এসে ধান খেয়ে যায়, তারা কি আর আসবে! প্রতি সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চে জোনাকির মেলা বসে তাও বোধ হয় আর বসবে না। বাঁশঝাড়ে সময় অসময়ে কাঠঠোকরার ঠক্ ঠক্ আওয়াজ তাও আর শোনা যাবে না।

যেতে হবে! এ জন্মের মত এ ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হবে।

আর ফেরা হবে না—এই চোখের জলের পিছল পথে।

কেউ কেউ এসে ঠাকুরকে বললেন, আমরা সব চলে যাচ্ছি বাবা। সবাই চলে যাবে। দেশ ভাগ হয়েছে। এ দেশ নাকি আর আমাদের না।

ঠাকুর বললেন, দেশ ছেড়ে কোথায় সব যাবেন। কপাল তো সঙ্গে সঙ্গেই যাবে। এত ভয় কেন? পিঁপড়ে যেমন বর্ষার আগে দলবদ্ধ ভাবে আশ্রয় খোঁজে, তেমনি ভাবে দলবদ্ধ হন।

উৎসব বেশ কিছুদিন হল শেষ হয়েছে। ভক্তরা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। এত বড় একটা উৎসব শেষে এ ধরনের ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক।

এমন সময় চৌমুহানী থেকে ঠাকুরের এক পত্র এল মহেন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে। ঠাকুর তাঁকে তাড়াতাড়ি দেখা করতে বলেছেন।

মহেন্দ্র চক্রবর্তী ব্যস্ত ভাবেই ছুটলেন ঠাকুরের কাছে। তাঁর মনে নানারকম সংশয়ের দোলা। কি যেন কেন তিনি ডেকেছেন।

ঠাকুর সন্নিধানে যেতেই তিনি বললেন, 'এসেছ ভালই হয়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার একান্ত প্রয়োজন। হাত পায়ের বাতের ব্যথা এখন বুকে ঠেকেছে। সুতরাং বুঝতে পারছ সবই এখন ঊর্ধ্ব-মুখী। শুক্র হচ্ছেন মৃত্যুর অধিপতি এখন রাহুর দশায়, শুক্রের অন্তর্দশা। সে কোন সময় কিছু একটা হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।'

মহেন্দ্র চক্রবর্তী মনমরা হয়ে পার্শ্ববর্তী ঘরে বিশ্রামরত। মনের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। তাঁর সোনা কাকা তো এ ধরনের কথা কোনদিন এর আগে বলেন নি। আজ তিনি কেন এসব কথা বলছেন। তবে কি তিনি এবার সবাইকে ফাঁকি দেবেন ?

দেখতে দেখতে দোলের উৎসব এসে গেল। পাহাড়তলীর মোহান্ত মহারাজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় চাঁদপুর যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

ঠাকুর এসময়ে মহেন্দ্রবাবুকে বললেন, 'ইচ্ছে হলে তুমিও যেতে পার।' মহেন্দ্রবাবু জবাব দিলেন, 'আমি এখানেই কয়েকদিন থাকব।'

তিনি যেন বুঝতে পেরেছেন ঠাকুর আর থাকবেন না। চাঁদপুর উৎসবে গেলে যদি আর দেখা না হয়।

ঠাকুর এতদিন একভাবে কথাবার্তা বলেছেন। ইদানীং তাঁর কথাবার্তার মধ্যে একটা বেসুরো ভাব।

দুরন্ত জলের ঢেউ শান্ত হলে যে ভাব এ ভাবও তেমনি।

মনে হয় যেন তিনি বাক্সপ্যাঁটরা বাঁধতে শুরু করেছেন।

যেতে হবে আপন ঘরে—কতদিন আর ভাড়াটে বাড়িতে বাস করা

যার। এই দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে তিনি যা দিয়েছেন তার তুলনা নেই। ঝুলি ঝেড়ে সবাইকে তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন। যে যা নিতে পেরেছে নিয়েছে। যারা পারে নি তাদের মন্দ ভাগ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাউকেই কোনদিন অবহেলা করেন নি। সবাইকেই কাছে টেনেছেন।

চৌমুহানীতেই ঠাকুর দোল উৎসব করলেন। আবীরে আবীরে লাল হয়ে গেল সারা আশ্রম। যারা এই উৎসবের সময় চৌমুহানীতে ছিলেন তাঁরাও বেশ বুঝতে পারলেন যে ঠাকুর বেশিদিন আর থাকবেন না।

ঠাকুরের এই ভাবের কথা চৌমুহানীতে পৌঁছালে সবাই চৌমুহানী আসার জন্য উদগ্রীব হল। এ বিষয়ে উপেন্দ্রবাবুকে জানানো হলে তিনি জানালেন, ঠাকুরের নির্দেশ কাউকেই আসতে হবে না।

ডিঙামানিকের মানিক বুঝি এবার চলে যায়।

শুধু পড়ে থাকবে শূন্য ডিঙা আর থাকবে অগণিত ভক্তের অশ্রুজল।

ঠাকুর এই সময় উপেনবাবুর ও নরেনবাবুর ওপর রাগ করে অতর্কিতে ফেনী চলে গেলেন।

তাঁরা দুইজন ঠাকুরের এই বিরাগে এতই মর্মাহত হলেন যে তা বলবার নয়। ঠাকুরের দেহরক্ষার পূর্বে অনেকটা সময়ই কেটেছে এই দুইজনের সান্নিধ্যে; তাহলে আজ তাঁর এই বিমুখীনতা কেন!

নরেনবাবু এত বেশি মর্মাহত হয়েছিলেন যে তাঁর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হল না।

উপেনবাবু নরেনবাবুকে বুঝিয়ে বললেন, 'ভাল যিনি বাসতে জানেন তিনি শাসন করতেও জানেন। ও নিয়ে মনমরা হয়ে থাকলে আমাদের চলবে না।'—

নরেনবাবু তাঁর দিকে মুখ তুলে চাইলেন।

উপেনবাবু আবার বললেন, 'আমি ঠিকই বলেছি, এর মধ্যে একটা

গভীর রহস্য নিশ্চয়ই আছে!'

নরেনবাবু বললেন, 'কি রহস্য এর মধ্যে থাকতে পারে?'

উপেনবাবুর দুচোখ জলে ভরে যায়।

তিনি কাপড়ের খুটে চোখ মুছে বললেন, 'বুঝলেন, ঠাকুর আমাদের দুজনকে খুব ভালবাসেন। ভেবে দেখুন তো ঠিক তাঁর দুচোখের মণির মতই ভাবেন কিনা। তিনি আর থাকবেন না তাই অন্তিম সময়ে আমাদের দূরে সরিয়ে দিতে চান।'

নরেনবাবু কাঁদছেন। কাঁদছেন উপেনবাবু। কে কাকে থামাবে।

উপেনবাবু চলে গেলেন ফেনীতে। উদ্দেশ্য ঠাকুরকে চৌমুহানীতে নিয়ে আসবেন।

তিনি যেতেই ঠাকুর বললেন, 'ইস্ কত কাইন্দাছেন আর কান্দেন না, আমি যে ভাইসা গেলাম। আপনাদের আমি মন্দ বলি নাই— আশীর্বাদ করছি! নেন এখন চলেন।'

'আর দেরী কইর‍্যা লাভ নাই।'

ফেনী থেকে এই তার শেষ যাত্রা।

ঠাকুরের সারা জীবনের সাধনার প্রদীপ বুঝি এবার নিবে যায়। এই প্রদীপের আলোতে তিনি শুধু নিজের মুখই দেখেন নি দেখেছেন লক্ষ লক্ষ আর্তজনের বিষাদক্লিষ্ট মুখ। তাদের দুঃখ দূর করার জন্য সারা জীবনই তিনি পরিক্রমণ করেছেন। গোটা জীবনটা তিনি টুকরো টুকরো করে মিছরির মত ছিটিয়ে দিয়েছেন ভক্তসমাজে।

মন্ত্র জপার সাধনা তিনি করেন নি।

তিনি করেছেন মানুষ সেবার সাধনা।

মানুষের মাঝেই ঈশ্বর। ঈশ্বরের মাঝে মানুষ নয়।

এই বোধ নিয়েই হয়েছিল তাঁর বোধোদয়। এই সত্তাই ছিল তাঁর রক্তের ধারায়। সেই সত্তার সব সত্ত্ব তিনি দান করে গেছেন ভক্তজন মাঝে। সত্যকার গ্রহীতা হয়ে সেই দান আমরা যেন মাথায় তুলে নিতে পারি।

অবশেষে সত্য সত্যই একদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। বাংলা ১৩৫৬ সালের ১৭ই বৈশাখ যখন ঠাকুর বিছানায় তখন তিনি উপেনবাবু ও নরেনবাবুকে বললেন, 'রাত্রিশেষে ঘুমঘোরে দেখলাম চন্দ্রলোক থেকে একখানা রথ নেমে এল। আমি তাতে উঠে চলে গেলাম।'

ঠাকুর সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। উপেনবাবু রাতে বাড়ি চলে গেলেন। নরেনবাবু পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন প্রাতে দেখা গেল ঠাকুর সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছেন। না আছে কণ্ঠেব তুলসীর মালা, না আছে কৌপীন ধুতি। গায়ে চন্দন তিলকও নেই।

সব কিছু পড়ে আছে। তিনি যেভাবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আজ আবার সেই বেশ ধারণ করেছেন। আজ তিনি মুক্ত। কোন বন্ধনই তাঁর নেই। সারা দেহ নীরব নিথর।

হঠাৎ ঠাকুরের চোখ মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার এসে আর কি করবেন! তার আগেই আমাদের প্রেমময় শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর ঊর্ধ্বলোকে চলে গেছেন।

সেদিনের তারিখটা ১৩৫৬ সালের ১৮ই বৈশাখ, রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া। মহেন্দ্রযোগ কি অপরূপ মহাপ্রয়াণের দিন!

আজ থেকে ৯০ বছর আগে অক্ষয় তৃতীয়াতেই ঠাকুর নাকি মাতৃজঠরে প্রবেশ করেছিলেন! এ কথা ঠাকুরের মুখ থেকেই জানা গেছে।

এক লহমায় এ কি কাণ্ড ঘটে গেল। খবর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল— লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল চৌমুহানীর বাড়ি। টেলিগ্রাম চলে গেল চারিদিকে।

দূরের ভক্তরা যাতে শেষ দর্শন পান সেইজন্য ঠাকুরের দেহ দুদিন রাখা হল। ছুটে এলেন শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ডিঙামানিকেও টেলিগ্রাম গেল কিন্তু তা দেরীতে পৌঁছানয় সবাই শেষ দর্শন করতে

পারল না।

চৌমুহানী আশ্রমেই দেহ সমাধিস্থ করা হল। ঠাকুর যে ঘরে বাস করতেন সেই ঘরেই রচিত হল সমাধি। সমাধির প্রয়োজনীয় ইট-বালি প্রভৃতি সবই এক নিমেষে যোগাড় হয়ে গেল।

যথাসময়ে সমাধি ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেল। ভক্তবৃন্দ অশ্রু ঝরাতে ঝরাতে সেই মহান পূত দেহ সমাধিস্থ করলেন।

ঠাকুর দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে নাকি উপেনবাবুকে বলেছিলেন, একখানা কম্বল দিয়ে দেবেন। গঙ্গার ধারে বড় ঠাণ্ডা বাতাস।

কিন্তু সেই কম্বলের কথা কারও স্মরণ হয় নি।

অবিরাম নাম সংকীর্তন চলল। ঘন ঘন উলুধ্বনির মধ্যে ঠাকুব ভূলোক ছেড়ে গোলকে চলে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অপ্রকট হয়েছেন। কিন্তু ভক্তগণের হৃদয় সিংহাসনে তিনি চিরদিনের মত বসে থাকবেন—সেখান থেকে তিনি কোনদিনই সরে যাবেন না।

তিনি যে ভক্ত প্রেমিক। ভক্ত ছাড়া তিনি থাকবেন কি করে।

ভারতবর্ষের এক সুমহান সিদ্ধ তাপস তাঁর কাজ শেষ করে নিত্য-ধামে চলে গেলেন। দেবদেবীর ভারতবর্ষ, সাধক মহাপুরুষেরা এখানের মাটিতে চিরকাল আসবেন ও যাবেন। এঁদের যাওয়াআসা চলবে ততদিন, যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে।

কালের কবলে পড়ে কত সভ্যতা কত সংস্কৃতির ধ্বংস হয়েছে। কত নগর, কত উপনগর প্রবল বন্যার প্রকোপে অথবা ভূমিকম্পের কবলে পড়ে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। দেশে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে। দেশ ভাগ হয়েছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে। কত উত্থান-পতন ঘটেছে।

কিন্তু এই ধ্বংসাবশেষের মাঝে এসেছেন কত সাধক, মহাপুরুষ। এসেছেন কত আত্মজ্ঞানী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।

আবার গড়ে উঠেছে তুলসীমঞ্চ। আবার গড়ে উঠেছে মন্দির

মসজিদ। এইতো আসল ভারতবর্ষ।

এই ভারতবর্ষের মাটিতে একদিন তীর্থ পথিক হয়ে এসেছিলেন শ্রীশ্রীরামঠাকুর—তিনি ঘরে ঘরে জ্ঞানের ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন।

আজ তিনি অপ্রকট হয়েছেন। তবু আছে সেই প্রদীপের শিখা, যে আলোয় চলবে আমাদের অনাগত ভবিষ্যতের পথ পরিক্রমা।

জয়রাম!

উপদেশামৃত/বেদবাণী

১

সংসার মায়াময়। বিকৃতি স্বভাবের তরঙ্গ সুখ দুঃখ অনুভূতির প্রশ্রয়, এই সকলই অভাব, ভ্রম বুদ্ধি মাত্র। অতএব পতি সেবাতে সর্বদা বিরত থাকিতে চেষ্টা রাখিবেন। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন না। পতি সেবার জন্য স্বর্গ নরক কিম্বা গভীর কালচক্রের ভ্রমণই হউক, তাহাই মঙ্গল সূত জানিবেন।

২

জীবগণ অনর্থক আশংকার অধীনে যাইয়া চিন্তার তরঙ্গে কষ্ট পায়। সংসারের যতই অভাব ততই শান্তি পরিণামে উদয় হয়। যাহাতে সমস্ত ভার ভগবৎপদে ন্যস্ত করিতে পারা যায় তাহাই করিবেন। উপস্থিত সংসারের কর্ম যথাসাধ্য শেষ করিতে চেষ্টা করিবেন। অন্য কোন চিন্তা না করিয়া যখন যেমন ভাবে পারিবেন ভগবৎ চিন্তা করিবেন অহঙ্কারবশতঃ কর্তৃত্বাভিমান যত ত্যাগ করিয়া ভগবানের অভিমানে উঠিতে পারেন তাহাই করিবেন।

৩

সর্বদাই বুদ্ধি স্থির করিয়া সমস্ত ভারের ভার গুরুর উপর রাখিয়া উপস্থিত কর্ম সকল সাহসের উপর নির্ভর রাখিয়া করিবেন। গুরু মঙ্গল করিবেন সন্দেহ নাই।

৪

সংসার মায়াময়। যাহাতে মমতা অর্থাৎ অহংজ্ঞান কর্তৃত্বা-ভিমান হৃদয়ের অন্তরে থাকে তাহাই ভজনা। এইজন্যই গুরুপ্রকরণ আশ্রয় করিয়া সকল ভার ভগবানকে দিয়া সংসারের বাধা অর্থাৎ ঋণ সকল যাহাতে শোধ করিতে পারা যায় তাহারই অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিবেন। ভগবান সংসারের আবরণ সকল অচিরেই নাশ করিয়া কুরুবদ্ধ পাণ্ডবের ন্যায় মুক্ত করিয়া নির্মল করিবেন এবং শান্তিভোগ দ্বারা পরমানন্দ প্রদান করিবেন, চিন্তা নাই।

৫

সর্বদাই গুরুর নিকটে থাকিতে লালসা রাখিয়া, তাঁহারই নিকটে তাঁহারই বাঞ্ছিত অবস্থায়, তাঁহারই কোলে ছোট ছেলেটির মত সর্বদা বসিয়া আছে এরূপ কল্পনা করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহার রক্ষিত জনের ভয় কি?

৬

এই সংসারে মায়ামুগ্ধবশতঃ বাসনা জালে চরাচর ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। প্রয়োজন বিষয় জানিতে না দিয়া কেবল অনিত্য অভাবেরই সৃষ্টি করিয়া ফেলে। মনে যাহা ভাল বোধ করে তাহাই করিয়া থাকে। তজ্জন্য হিতাহিত বর্জিত হইয়া কেবল বাসনায় বদ্ধ হয়। সংসার ক্ষয় হয় না। কেবল জন্মমৃত্যুর দণ্ড লাভ করে।

৭

ভাগ্যই সকল ফলদাতা। কেবলমাত্র কর্মই জীবের অধিকার। ভাগ্যকে ছাড়িয়া ভুলবশতঃ প্রার্থনার সঞ্চার হইয়া থাকে। সত্য-নারায়ণই জীবের জন্মমৃত্যু জরাবদ্ধ হইতে মুক্তি করিতে সমর্থ। সত্যনারায়ণের সেবা করিবেন।

৮

সত্যনারায়ণকে ভুলিবেন না। তাঁহার কৃপায় এই মরভূমি হইতে জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। ভাগ্যানুসারে জীব দেহ, গেহ সমাজ পাইয়া থাকে। কর্মেরই অধিকার, জীবের ফলের অধিকার নাই। ফল দাতা সত্য জানিবেন।

৯

ভাগ্য হইতেই লোক ফল লাভ করিয়া থাকে। অতএব মনের দ্বারা লোক শুভাশুভ বোধ করিয়া থাকে। তজ্জন্য চিন্তা না করিয়া অন্নপূর্ণার অধীনে থাকিতে চেষ্টা করুন।

১০

সত্যই পূর্ণ। অসত্য অপূর্ণ। অভাব প্রবাহমান, স্থিতি নাই। ইহাকেই মরুভূমি বলে। সত্যকে বাদ দিয়া ত্রিজগতে চৌদ্দ ভুবনের কোন লোকই কোন কার্যক্ষম হইতে পারে না। আপনি সত্যের জন্য ধৈর্যশীল হউন। সত্যই আপনার শান্তিস্থান জানিবেন। অনন্য চেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ, ভগবৎবেদ। এই বেদই সর্ব ঋণ মুক্ত করেন। ঋণ মুক্ত হইলেই বিষ্ণুশর্মা, বিষ্ণুপ্রিয়ার উদয় হয়। সকল রকম বন্ধন ছিন্ন করিয়া সত্যময় অখণ্ড সত্তার যোগ প্রাপ্ত হয়।

১১

পিতৃ সম্পদ হয় ধর্ম, পতি সম্পদ হয় কর্ম, পুত্র সম্পদ হয় পবিত্র। এই তিনকুল সাবিত্রী ব্রত জানিবেন। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। ফাঁকিতে না পড়িয়া পিতৃসম্পত্তি উদ্ধার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিতে নাই। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র। ভাগ্যকে মান্য করিয়া ভাগ্যরথে চলিলে দেহত্যাগ হইয়া দেহীকে মুক্ত করিতে

পারে। নিজ নিজ দাবী না করিয়া কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয়।

১২

অদৃষ্ট হইতে যাহাই হইবে বহন করিতে কোন বিষয়ে চঞ্চল হইতে নাই। ভগবান যাহা করেন তাহাতে কোনরূপ অমঙ্গল হয় না। কারণ তিনি মঙ্গলময়। ভ্রান্তিবশতঃ নানান বিষয় দ্বারা চঞ্চল হইয়া জীব সকল দুঃখ পায়। ভগবানে নির্ভর করিয়া থাকিলে তিনি মঙ্গলই দান করেন।

১৩

ভগবান সর্বত্র সম প্রকৃতির আশ্রয় নিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। গুণ আবর্তনে বিষমত্ব লাভ হইয়া অজ্ঞানতাবশতঃ সুখ দুঃখ, আয় ব্যয়ে পরিণত হয়। এই দুঃখজ মুক্তির জন্যই ভগবৎ সেবায় রত থাকিয়া নিরপেক্ষতা লাভ করেন, ইহাই মুক্তি। পাপপুণ্য দ্বারা জীবের শরীরে ভোগ হয় না, প্রাক্তনলব্ধ জন্য হইতে ব্যাধিসকল আক্রমণ করে। সমস্তই গ্রহবৈগুণ্য মাত্র। কালচক্রের গতি অনবরত পরিক্রমণ করিয়া থাকে। যখন যে সত্ত্বায় উপভোগে অধিষ্ঠান থাকে তাহাই ভোগে লিপ্ত হয়।

১৪

কালী আর কৃষ্ণ, কি রাধা, কি ভগবান দ্বিতীয় কিছুই নাই। সকলই একাদশ বলিয়া জানিতে হয়। যতকিছু ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া কি দেখা যায় সকলই পতির বিভূতিমাত্র জানিতে হয়। তাহাতে ক্ষোভের হেতু নাই।

১৫

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আশেপাশে সর্বত্রই মাতা বিরাজপুর, মাতা

ছাড়া কি আছে শব্দ জানি না। স্থিরা, ধীরা, গভীরা রূপেতে মাতা আকাশ পাতাল সমষ্টিতে (?) মা। মা আপনাকে সর্বদা কোলে রাখিয়াছেন। মা ছাড়া আপনি কোথাও নাই। মার কুক্ষি পূর্ণ করিয়া অবিচ্ছেদ থাকুন।

১৬

ধৈর্য ধরিয়া সকল কর্ম করায় নামই হয়। ধর্ম অনন্ত চেতনায় অধিষ্ঠানের নামকেই কর্ম বলিয়া ঋষিগণ প্রকাশ করেন। সর্বদাই ভগবানের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার কর্ম করিয়া যাইতে হয়। যেহেতু ভগবান নিরপেক্ষ, অসঙ্গ বলিয়া খ্যাত আছেন।

১৭

সংসারের তরঙ্গে লক্ষ্য রাখিয়াই জীব বদ্ধ হয়। তাহাতেই লাভ লোকসান অনুভূতি হইয়া থাকে। ইহাতেই সুখ-দুঃখকর শান্তি অশান্তির তরঙ্গ চলিয়া থাকে। অতএব ঐ দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল শূন্য ভাবে অর্থাৎ আকাশের দিকে চিন্তাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে পরম শান্তির উদয় হয়। ভালমন্দ যাহা হয়, সেই সকল অতিথির ন্যায় মনে ধারণা করিতে চেষ্টা করিতে হয়।

১৮

ঐহিক সুখ আর দুঃখ সকলই ক্ষণভঙ্গুর। ক্ষমাই দয়ার আঁধার ত্যাগই সত্যের সার। পবিত্রতাই ধর্ম। যাহাতে মনের কোন রকম অশান্তি মলিনত্ব না হয়, তদ্বিষয়ে সহিষ্ণুতা দ্বারা মার্জনা করাই উচিত। ক্ষণিক সুখে মজিয়া থাকিলে পরে পরিণামে দুঃখই থাকে। পরিত্রাণের জন্য অবশিষ্ট সুখরূপ সত্যের লেশও থাকে না। ঐহিক সুখে মত্ত হইয়া কৃত ধর্ম নষ্ট করিতে নাই।

১৯

বোঝা এবং না বোঝা দুইই এক, কারণ উভয়েই ভ্রান্ত। এই দুইয়ের অভাবই শান্তি।

২০

সত্যকে সেবা করিতে করিতে সতী হয়। পতিব্রতা হইলে কালের হাত হইতে সত্যকে উদ্ধার করা যায়।

২১

চিন্তায়, কার্যে শ্বাস প্রশ্বাসে স্থির ভাব অবলম্বন করিয়া পতিব্রতা বা ভগবন্নিষ্ঠ হইলে শুচি হয়।

২২

সংসার শব্দটিই অভাবের স্মারক, যাহাতে মনের সুখদুঃখ উদয় হয়, তাহাই সংসার।

২৩

শরীরের প্রারব্ধ ঋণ পরিশোধ যে পর্যন্ত না করা যায়, সেই পর্যন্ত ভোগাদির প্রতি কোন হাত নাই। যখন যাহা উপস্থিত হইবে তাহা ভোগ করিতে হইবে।

২৪

স্থির হইবার চেষ্টা করিতে সকল অবস্থায়ই অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ করিতে করিতে নিত্য পবিত্রতা লাভ করিয়া আত্মার বিদিত হইতে পারে।

২৫

প্রারব্ধাদি ভোগ ক্ষেত্রে ভোগান্ত অবস্থায় কিছুই থাকে না।

সকলি সম হয়। ভাগ্যক্রমেই সকল জোটে—এই জ্ঞানে সকল বেগই সমভাবে কাটাইতে হয়।

২৬

সর্বদাই সহিষ্ণুতার অনুগত থাকিতে চেষ্টা করিতে হয়।

২৭

সংসার মায়াময় ভ্রান্তিজনক। যাহা কিছু বোধ করা যায় তাহা সকলি ইন্দ্রিয়জাল মাত্র। মনের দ্বারা যাহা লব্ধ হয় সকলই ইন্দ্রিয় ভোগ মাত্র। ইহার সঙ্গে বুদ্ধিজ্ঞান সতত অস্বাভাবিকভাবে চলিতেছে বলিয়া যাহা মনেতে আশ্রয় পায় সকলই ভ্রম। অতএব মনের আহরিত বস্তুর জন্য পিপাসিত হইতে নাই। জগতে যাহা কিছু অনুভূতি হয় সকলই ইন্দ্রিয় জানিবেন, ইহাই কেবল সুখদুঃখ ফল প্রসার করিয়া জীবদ্দশাকে চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করাইয়া লয়। সর্বদাই পতিব্রতাচরণ করিয়া গুরোপদ্দিষ্ট কর্মের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিতে চেষ্টা করিবেন। লাভ-লোকসান, সিদ্ধ-অসিদ্ধ গতিতে উপেক্ষা করিয়া মাত্র উদ্দিষ্ট আশ্রয় কর্মে মজিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবেন। উদ্ধার গুরুপদই করিবে। ভালমন্দের প্রতীক্ষায় থাকিলে পতিব্রত ধর্ম-অভিচারী হইয়া সত্তায় মলিনত্ব ঘটে।

২৮

নামকে সংকীর্তন বলে। অষ্টপ্রহরকে অষ্টকাল, অষ্টনাম, আটপাশ বলিয়া জানিবেন। নামে অষ্টপাশাদি সকলে মুক্ত হয়। মানুষ সকলি মানুষ। মানুষের কোন দোষ নাই। মানুষ শব্দই জ্ঞানী বুঝায়। ভাগ্যানুসারেই প্রকৃতির গুণের বিকাশ হয়। তাহাতেই ভালমন্দ, সৎঅসৎ উপলব্ধি হয়। অতএব অষ্টপ্রহর নাম করিতে করিতে কাপড়াদি উপকরণ কিছুই লাগে না। কেবল নামের অধীনস্থ জ্ঞান জন্মিলে? নামের

সেবক হয়। নামই সত্য। নামের দাস সেই সত্যই লাভ করিয়া থাকে। নামেই উদ্ধার করে, মনেরও কোন দরকার হয় না। মন প্রকৃতির গুণের দ্বারায় প্রকাশ হয়। মনেই শান্তিঅশান্তি বোধ হয়। ঘুমাইলে কেহই থাকে না।

২৯

ভাগ্য অনুসারে জীবের সঙ্করে ফলাফল ভোগ করে। অতএব সত্যকে স্মরণ করিয়া সত্য নিয়া থাকিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করিবে।

৩০

এই জগতে পর কেহ নাই। অহঙ্কার বশেই আপন পর বলিয়া মনে হয়।

৩১

ভগবানের কৃপার লক্ষ্যে সর্বদা থাকুন। অন্ধকারে চলিতে হইলে একটা আলো নিয়া চলাই কর্তব্য।

৩২

বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বা-ভীযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার সেবক হইয়া সকল বাসনা জঞ্জাল হইতে উন্মুক্ত হউন।

৩৩

সর্বদা নাম করিবেন। নাম পরমব্রহ্ম জীবের মোক্ষ ধর্ম। নানা চিন্তা-ভাবনা না করিয়া যাহাতে সর্বরকম ন্যস্ত করিয়া সংসারের যাবতীয় কর্ম করিয়া কর্মক্ষেত্রের ঋণ পরিশোধ করিয়া লইতে পারেন তাহার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।

৩৪

নাম এবং ভগবান একই পদার্থ। নাম সর্বদা হৃদয়ে জাগিয়া থাকিলেই নাম প্রতিষ্ঠা এবং চৈতন্য হইয়া থাকে। নাম করিতে করিতে ভালই লাগুক মন্দই লাগুক, নামই উদ্ধার করিয়া নিবে। ...(গ্রহরূপী জনার্দন) ভগবানের নাম করিতে করিতে গ্রহবৈগুণ্য সকল সহজ ভোগে কাটিয়া যায়।

৩৫

মানুষের প্রকৃত অভাব অতি কম। কল্পিত অভাবই সর্বনাশের মূল।

৩৬

অনেক কিছু এক সঙ্গে আরম্ভ করিলে দরিদ্রতা আসে। একটা নিয়াই থাকা ভাল।

৩৭

যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য যে যা করে তাহাতে আসক্তি হইয়া পড়িয়া থাকিলে যাহা লাভ হইবে তাহাতেই সংসার কার্য নির্বাহ করিবার চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলে জীবের কোন অভাব হয় না। ভাগ্যের অতিরিক্ত.আশাধারী হইলে কোন ব্যক্তিই কুলন করিতে পারে না, কারণ ভাগ্যের অধিক পাওয়া দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র।

৩৮

ভাগ্যকে মানিয়া ভাগ্য রথে চলিলে সকল ঋণ মুক্তি হইয়া পরমানন্দ অবিমুক্ত পদলাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।

৩৯

সংসার অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান দ্বারা জীবের কালচক্রের গতি হইতেছে। সেই গতির যে অংশে যে ভাব মিলন হয় তাহাই ভোগ

হয়। এই ভোগ দান (ত্যাগ) করা জীবের কর্ম। তুলসীপত্রের দ্বারা ভোগ দান করিতে হয় অর্থাৎ সহ্য করিয়া থাকিবার চেষ্টা করা। যখন ভোগদান শেষ হইয়া যায় তখনই স্বরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হয়। কর্তা হইয়াই অস্থায়ী চক্রে পড়িতে হয়। ইহা সকল শাস্ত্র মধ্যেই উল্লেখ করিয়াছে।

৪০

সকল ভারই গুরু বহন করিতেছেন, করিবেন। তজ্জন্য চিন্তা করিবে না। যাহা পার করিবে, না পার না করিবে। সর্বদা তাঁহার পদে অনন্য মতি রাখিবার চেষ্টা করিবে।

৪১

মনকে সর্বদা সবল রাখিবে। বাসনা মনকে চঞ্চল করিয়া ফেলে শান্তি অশান্তি তাহাতেই হয়। সর্বদা গুরুর উপর ভার দিয়া সংসার চালন কার্যেতে থাকিবে।

৪২

সর্বদা অনাসক্ত হইয়া উপস্থিত কার্যকর্মাদি সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবে। কাজে অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী সুখজনক গোলমাল না করিয়া গুরুর কার্যে রত থাকিবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিবে। পবিত্র আপনাকে ছাড়িয়া অনিত্য অসুখকর ক্ষণসুখের দিকে লক্ষ্য রাখিবে না। সকল বেগ সর্বদা সহ্য করিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। কাহারও দোষগুণ লইবে না।

৪৩

সর্বদা নাম করিবে। নামই সকল অভাব দূর করে, মনকে স্থির করিয়া দেয়।

৪৪

সর্বদা সহিষ্ণুতার আশ্রয় নিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। ধৈর্যই ধর্ম। ধৈর্যই কর্ম। ধৈর্যই সহায়।

৪৫

সর্বদা প্রাণ যাহা শরীরের মধ্যে আছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাম করিবে। নাক দিয়া যে শ্বাস প্রশ্বাস যায় তাহার প্রতি লক্ষ্য করিবে না। ধীর হইয়া বসিয়া যতটুকু সময় পারা যায় বাজে কথা না বলিয়া ঐ নাম মনে মনে উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণের সন্ধান জানিতে পারিবে।

৪৬

পরের দোষ দেখিতে নাই। আপন দোষগুলির অনুসন্ধান করিয়া সর্বদা দোষগুলিকে পবিত্র করিতে হয়।

৪৭

অদৃষ্টচক্রে যাহা জুটিবে তাহার দ্বারাই সন্তোষ থাকিতে হইবে। ভ্রান্তিবশতঃ হাহুতাশ করিতে নাই।

৪৮

বিবাহ করিলে সংসার বন্ধন হয় না। আসক্তিই বন্ধন করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি সকলেই বিবাহ ও সংসার পালন করিয়াছেন।

৪৯

সংসার শব্দই ভ্রান্তিজনক শব্দ। সুখেদুঃখে, পাপেপুণ্যে জড়সড়, শান্তি খুঁজিয়া ইহার হাত হইতে ত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। নিত্য সুখলাভ করিতে হইলে অগ্রে সুখের ইচ্ছা ছাড়িয়া দিতে হয়।

৫০

সংসারে চিন্তা না করিয়া উপস্থিত যাহা যখন কর্ম হয় তাহা যথাসাধ্য আয় অনুসারে কুলন করিতে ব্যবস্থা করিয়া যথা সময়ে যাহা পারা যায় স্থির চিত্তে গুরুর কার্য করিবে। ভগবৎ চিন্তা যাহা যখন পারা যায় তাহাই ভাল।

৫১

নলরাজা, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবে। তাঁহারা কতই না সহ্য করিয়া ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন। ধর্মের পর আর কিছু সম্পদ নাই। স্ত্রী-পুত্র-কলত্রাদি ধনজন সকলি দুঃখের আকর। ইহাদের ভাবিতে গেলে সুখ কিছুই নাই। ভ্রান্তিবশতঃ সুখ বোধ হয়। তাহাও ক্ষণস্থায়ী, দুঃখই বেশি। অনিত্যকর বিষয়ের জন্য দুঃখ করা সকলি ভুল। কোন চিন্তা করিবেন না। কেবল গুরুর উপর সমস্ত ভার দিয়া খাঁটি হইয়া স্থিরভাবে গুরুবাক্য পালনে যত্নশীল হইবে।

৫২

স্ত্রীপুত্র পরিজন যাহারা মুখাপেক্ষী হইয়া আছে তাহাদিগকে যথাসাধ্য ভরণপোষণ করাই ধর্ম, ইহাতেও ভগবানের সেবা হয়। অনাসক্তভাবে এদের সঙ্গ লাভ হইলে মঙ্গলই হয়।

৫৩

একমাত্র শরণ নিয়া থাকাই পরমানন্দের গর্ভে ক্ষেপণ করিয়া থাকে। যাহা যখন পার, করিবে। মনে রাখিবে, আমার একজন উদ্ধারের কর্তা এই প্রাণরূপে সর্বঘটে সমান সত্ত্বায় বাস করেন।

জয় রাম জয় রাম জয় রাম।
